এই বইয়ের নাম অন্য মলাটে

সুজন দাশগুপ্ত

সামনের মলাটে লেখা : এই বইয়ের নাম অন্য মলাটে। এটা দেখে যিনি পিছনের মলাটে এই বইয়ের নাম খুঁজতে যাবেন, নিশ্চিত ধন্দে পড়বেন। কেন না, পিছনের মলাটেও একইভাবে লেখা রয়েছে : এই বইয়ের নাম অন্য মলাটে।

তা হলে এ-বইয়ের আসল নামটি কী ? কোথায়ই-বা লেখা রয়েছে সেই নাম ? যে-ধরনের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে এই বই, নামকরণের এই হেঁয়ালির মধ্য দিয়েই তার সঙ্গে পাঠকের প্রাথমিক পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন গ্রন্থকার সুজন দাশগুপ্ত।

পৃথিবীর বিখ্যাত কতিপয় যুক্তিনির্ভর সমস্যা ও তার সমাধানের পন্থা, মজার-মজার 'অসম্ভব' কিছু ছবি ও তার স্রষ্টা, সম্ভাবনাভিত্তিক নানান হেঁয়ালি, দৈনন্দিন জীবনে ছড়িয়ে-থাকা বিশ্ববিখ্যাত কিছু 'প্যারাডক্স', রেমন্ড স্মালিয়ান উদ্ভাবিত দুর্ধর্ষ কিছু ধাঁধা এবং জনপ্রিয় কয়েকটি ধাঁধাধর্মী খেলনার কথাই বুদ্ধি-শানানো এই বইতে। এ-বই পড়তে

ISBN 81-7215-256-6

মজা, আরও মজা—
আলোচিত ধাঁধা, হেঁয়ালি আর
সমস্যাগুলোর সমাধান
করতে।

প্রচ্ছদ ☐ সুব্রত চৌধুরী

এই বইয়ের নাম অন্য মলাটে

সুজন দাশগুপ্ত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ১৯৯৩
প্রচ্ছদ সুব্রত চৌধুরী

ISBN 81-7215-256-6

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১৫·০০

আমার দাদা ডক্টর সুমন দাশগুপ্তকে—

বইয়ের কভারে পরিষ্কার লেখা : এই বইয়ের নাম অন্য মলাটে। কথাটা সত্যি মনে করে কেউ যদি অন্য মলাটে নামের খোঁজ করতে যায়, তাহলে সে ফাঁপরে পড়বে। কারণ, সেখানেও লেখা : এই বইয়ের নাম অন্য মলাটে। কী মুশকিল! তাহলে বইয়ের নামটা সত্যিকারে কোথায়? উত্তর হচ্ছে দুই মলাটেই। বিদঘুটে হলেও এই বইয়ের নাম : 'এই বইয়ের নাম অন্য মলাটে'।

সূচী

সমস্যা ও তার নানান সমাধান ৯
এম.সি. এশারের ছবি ২৯
নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তার চক্কোরে ৪১
দৈনন্দিন জীবনের 'প্যারাডক্স' ৫০
রেমন্ড স্মালিয়ানের মজাদার ধাঁধা ৫৭
দুটি জনপ্রিয় ধাঁধার খেলনা ৬৫

সমস্যা ও তার নানান সমাধান

আমেরিকার এক মনোবিজ্ঞানী কয়েকবছর আগে শিম্পাঞ্জীদের বুদ্ধি নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। একদিন একটা শিম্পাঞ্জীকে ঘরে এনে তার সামনেই তিনি কড়িকাঠে একটা বড়সড় পাকাকলা সুতোয় বেঁধে ঝোলালেন। তবে সুতোটা এত ছোট রাখলেন যে, শিম্পাঞ্জীটা মেঝে থেকে যতই লাফাক না কেন—কলাটার নাগাল যেন না পায়। তারপর তিনি বেশ কয়েকটা কাঠের বাক্স জোগাড় করে ঘরের চারদিকে দেয়াল ঘেঁসে সাজালেন। মনোবিজ্ঞানী পরখ করতে চাইছিলেন যে, শিম্পাঞ্জী বুদ্ধি খাটিয়ে বাক্সগুলো টেনে টেনে কড়িকাঠের নিচে এনে, একটার ওপর একটা বসিয়ে তার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে কলাটা পাড়তে পারে কিনা!

শিম্পাঞ্জীটা এতক্ষণ ঘরের এককোণে চুপচাপ বসে জুলু জুলু চোখে মনোবিজ্ঞানীর কীর্তিকলাপ লক্ষ্য করছিল। বাক্সগুলো সাজিয়ে ঘর থেকে বেরোবার মুখে মনোবিজ্ঞানী যখন কড়িকাঠের ঠিক নিচে এসে পৌঁছেছেন, শিম্পাঞ্জী তড়াক করে মনোবিজ্ঞানীর কাঁধে উঠে কলাটা পেড়ে হাওয়া!

শিম্পাঞ্জীর এই উপস্থিতবুদ্ধিতে মনোবিজ্ঞানীমশাই আদৌ মুগ্ধ হয়েছিলেন কিনা—তার উল্লেখ অবশ্য গল্পে নেই। ঘটনাচক্রে এও জানা হয়ে ওঠে না যে, শিম্পাঞ্জীরা জটিল চিন্তাভাবনা করতে সত্যিই কদ্দূর সক্ষম! তবে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যার জগতে সমস্যার সহজতম সমাধানটি খুঁজে বার করতে পারাতেই সত্যিকারের সাফল্য। অতএব, শিম্পাঞ্জীকে বাহবা না দিয়ে উপায় নেই! অন্যপক্ষে, মনোবিজ্ঞানীমশাই খানিকটা অন্ধভাবে সমস্যাটির বিচার করছিলেন। সমস্যা সমাধানে যে শুধু বাক্সই ব্যবহার করতে হবে, বিকল্পে অন্যকিছু—এক্ষেত্রে তাঁর শরীরটিকেও যে ব্যবহার করা সম্ভব—সেটা তাঁর মাথায় ঢোকেনি। তবে এ ধরনের ভুল অনেক সময়েই ঘটে—সমস্যা সমাধানের সহজ উপায়গুলো অদ্ভুতভাবে আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

কার্যকরী সহজ সমাধান কীভাবে মানুষের নজর এড়ায়—তার সবচেয়ে মজাদার উদাহরণ অবশ্য দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর 'জুতো আবিষ্কার'

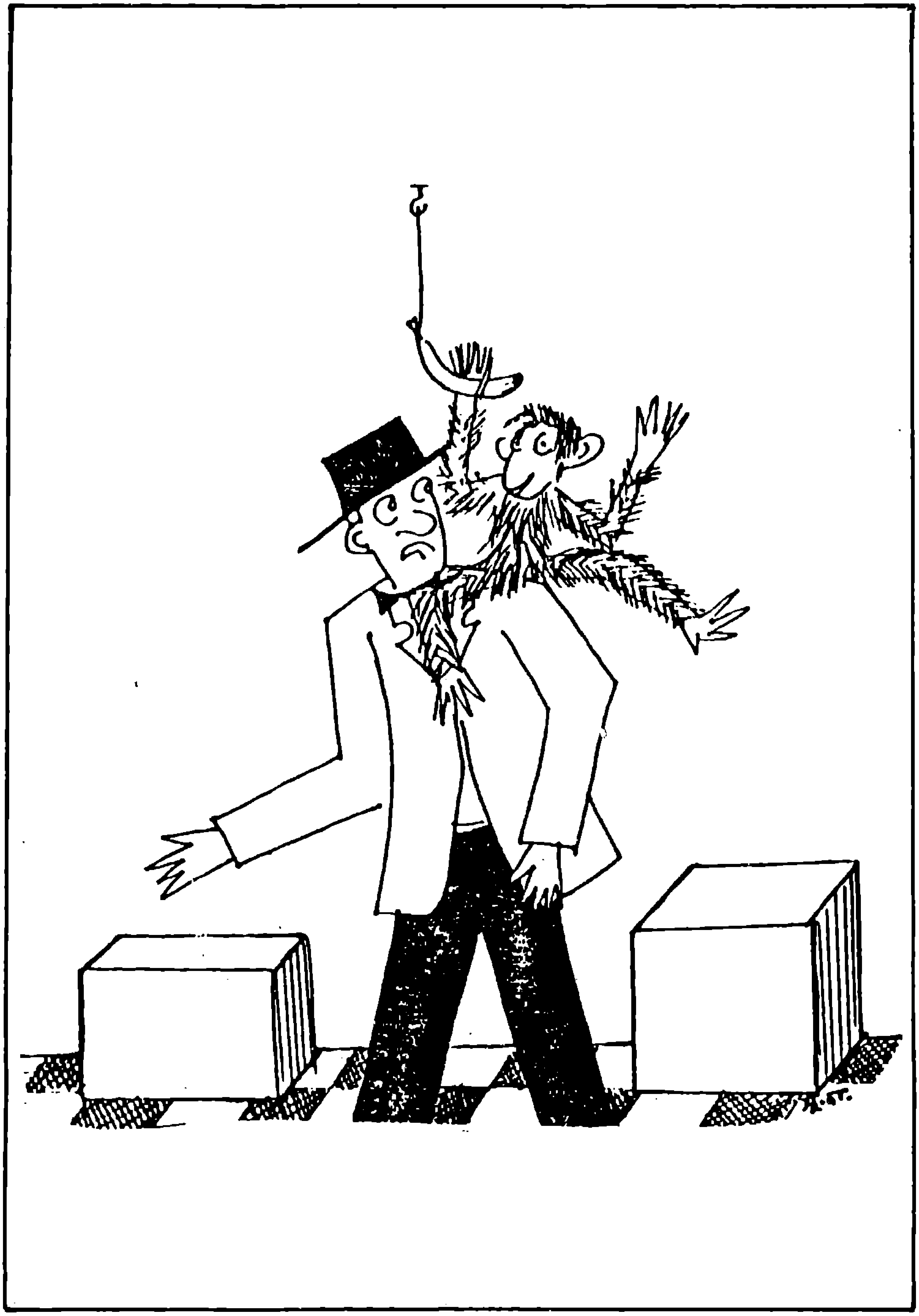

কবিতায়। রাজা হবুচন্দ্রের পায়ে যাতে ধুলো না লাগে, তার জন্য ভেবে ভেবে হদ্দ হচ্ছেন মন্ত্রী গবু রায় ও অন্যান্য গুণবন্তরা। তাঁরা একবার বলছেন, মাদুর দিয়ে পৃথিবী ঢাকা হোক ; একবার বলছেন, রাজাকে বন্ধ ঘরে আটকা রাখা হোক, ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, এগুলোর কোনোটাই রাজামশাইয়ের মনঃপূত হচ্ছে না। শেষমেষ প্রস্তাব উঠল চামড়া বিছিয়ে সারা পৃথিবী মুড়ে ফেলার। সেটা বলা সহজ, কিন্তু যোগ্যমত চামার পাওয়া যাবে কোত্থেকে ? এই নিদারুণ কঠিন সমস্যার সমাধান করলো অবশ্য একটি সাধারণ মুচি। সে বলল, পৃথিবীটা না ঢেকে—চামড়া দিয়ে শুধু রাজামশাইয়ের পা-টা ঢাকতে। কি ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া ! ব্যস, পৃথিবীতে জুতো পরার চল শুরু হয়ে গেল !

এইখানে এবার একটু থামা যাক। 'জুতো আবিষ্কার' পড়ে দারুণ মজা লাগলেও যে-টা নিয়ে আমরা একদম ভাবি না, সেটা হল : কীভাবে জুতো তৈরির দুর্ধর্ষ চিন্তাটা মুচিপ্রবরের মাথায় এসেছিল ? অনুমান করি, সমস্যা সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা তার মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। কেন জানি তার মনে হয়েছিল যে, পৃথিবীর কথা না ভেবে শুধু পা-টা নিয়েই ভাবা যাক। কিন্তু সম্ভাবনাটা হঠাৎ করে 'ঝিলিক' দিল কেন ? চিন্তার এই স্ফুলিঙ্গটা এলো কোত্থেকে ? চিন্তাধারাটা সেই সময়ে ঠিক কোনখাতে বইছিল যার জন্য সম্পূর্ণ নতুনভাবে চিন্তা করার পরিবেশটা তৈরি হয়েছিল ? দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় মুচিপ্রবরের ভাবনাচিন্তাগুলো মোটেই বিশদ করে লেখেননি ! যদি লিখতেন, তাহলে নিউরোসায়েন্স, কগনিটিভ সাইকোলজি, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের একটি শাখা 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্স' নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন—তাঁরা সকলেই চিরঋণী হয়ে থাকতেন। কারণ, কেমন করে মানুষ চিন্তা করে, নতুন জিনিস উদ্ভাবন করে, সমস্যার সমাধান করে যে সেগুলো তাঁদের কাছে পরম মূল্যবান তথ্য।

মানুষের চিন্তা করার প্রক্রিয়া আর উদ্ভাবনশক্তির মূলসূত্রটি যদি সত্যিই আবিষ্কার করে ফেলা যেত, তাহলে সেগুলো কম্পিউটারকে শিখিয়ে পড়িয়ে আমরা চিন্তাভাবনা চুকিয়ে নিশ্চিন্তমনে বসে থাকতে পারতাম ! কম্পিউটারই সর্বসমস্যার সুরাহা করে দিত ! মুশকিল হল, সেই সূত্রটির হদিশ বিজ্ঞানীরা এখনো পাননি। যদ্দিন পর্যন্ত সেটা না পাওয়া যাচ্ছে, দুর্ভাগ্যবশত তদ্দিনই আমাদের এই ক্ষুদ্র মগজটিকে খাটিয়ে খেতে হবে। ঠিক এই কারণেই যুক্তিবুদ্ধি শাণিত করে চিন্তাধারাকে সুসংবদ্ধ করাটা আমাদের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। বেশ, সেটা না হয় মানা গেল, কিন্তু ক্ষমতাটা আসবে কোত্থেকে ? এর উত্তর

দু-কথায় দেওয়া যাবে না। তবে একটা কথা ঠিক যে, বিভিন্ন ধরনের ধাঁধা বা সমস্যার সঙ্গে পরিচিতি এবং তাদের সমাধানের প্রচেষ্টা—এই ক্ষমতাকে গড়ে তুলতে কিছুটা অন্তত সাহায্য করে। কথাটা লিখছি অবশ্য ভয়ে ভয়ে, কারণ আমি জানি যে, ধাঁধা বা সমস্যার কদর আমাদের দেশে খুব একটা নেই। বিশেষ করে বড়দের কাছে এগুলো হচ্ছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার—বাজে সময় নষ্ট! একদিক থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে খুব একটা অভিযোগ আনতে পারি না। এই পৃথিবীতে এমনিতেই এত সমস্যায় আমরা জর্জরিত যে, ধাঁধার বাড়তি সমস্যাগুলো ঘাড়ে নেবার সময় কোথায়? তবে সৌভাগ্যের কথা যে, ছোটদের মধ্যে অনেকেই ধাঁধার ব্যাপারে অল্পবিস্তর উৎসাহী। নানান ধরনের ধাঁধা সমাধানের সুযোগ যদি তারা পায়, তাহলে অনেকেই নিঃসন্দেহে নতুনভাবে চিন্তা করতে শিখবে। তারপর ভবিষ্যৎ-এ তাদের মধ্যে কেউ যদি আমেরিকায় আসে এবং কার্নেগী মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়—তাহলে তো কথাই নেই। 'প্রব্লেম সলভিং'-এর ওপর পুরো একটা কোর্সই সে নিয়ে নিতে পারবে! বলাবাহুল্য, 'প্রব্লেম সলভিং' বস্তুটির এই গুরুত্বটা আমেরিকাতে অনেকেই এখন উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন।

প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ধাঁধা বা সমস্যা বলতে আমি ঠিক কি বোঝাচ্ছি। সমস্যা বহুরকমের হতে পারে। যেমন ধরা যাক, রামবাবু থাকেন নাকতলাতে, তাঁকে যেতে হবে শিবপুর। রামবাবু কোনদিন শিবপুর যাননি—অবশ্যই এটা ওঁর কাছে একটা সমস্যা। কিংবা ধরা যাক, শ্যামবাবুর কথা। তিনি অফিসপাড়ায় দুটো চাকরি পেয়েছেন। দুটো চাকরিই কাজের দিক থেকে চমৎকার; মাইনেও শুরুতে এক—মাসে ৩০০০ টাকা। শুধু একটা কাজে প্রতিমাসে সেটা বাড়বে ২০ টাকা করে। অন্য কাজে সেটি আধমাস অন্তর ৫ টাকা করে বাড়বে। আধমাস অন্তর এইজন্য যে, সেখানে মাসের মাইনে দুটো কিস্তিতে দেওয়া হয়—মাসের মাঝামাঝি একবার ও মাসের শেষে একবার। শ্যামবাবুর সমস্যা হল, কোন চাকরিটা তিনি নেবেন।

যদি আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে দেখবো যে, সমস্যামাত্রেরই দুটো অবস্থা আছে। একটি হল বর্তমান অবস্থা, অর্থাৎ যেখানে আমরা রয়েছি। অন্যটি হল ভবিষ্যৎ অবস্থা, অর্থাৎ যেখানে আমরা যেতে চাই। এই দুই অবস্থার মধ্যে নানান বাধানিষেধের 'পাঁচিল' খাড়া করা রয়েছে। সেই 'পাঁচিল'-টা কোনমতে টপকাতে পারাটাই হল 'সমাধান'। কিন্তু 'পাঁচিল' টপকানোর কাজটি আরম্ভ করার আগে আমাদের নিশ্চিন্ত হতে হবে যে,

'পাঁচিল'-এর স্বরূপটি ঠিক কি। যেমন, রামবাবুর নাকতলা থেকে শিবপুরে যাবার একটা বাধা নিশ্চয় যানবাহনের। কিন্তু 'পাঁচিল'টা শুধু যানবাহনজনিত নাও হতে পারে। রামবাবুর পকেট যদি শূন্য হয়, সেটাও যাবার ব্যাপারে একটা বাধা। যাবার জন্য হাতে যদি অল্প সময় থাকে, সেটাও আরেকটা বাধা, ইত্যাদি। অর্থাৎ, রামবাবুকে অনেককিছু বিচার বিবেচনা করে এ ব্যাপারে এগোতে হবে। মজার ব্যাপার হল, আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে এত অভ্যস্ত যে, চিন্তার এই প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে আমরা অনেক সময়েই সচেতন নই।

কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যাটি একটু ভিন্ন। এতে কিছু সচেতন হিসেবের প্রয়োজন। এই সমস্যায় বাধানিষেধের পাঁচিলটা হল আর্থিক। অর্থাৎ, আমাদের বিচার করতে হবে, কোন চাকরিটা মাইনের দিক থেকে ভাল। প্রথম চাকরিটা নিলে শ্যামবাবু প্রথম মাসের শেষে পাবেন ৩০০০ টাকা। দ্বিতীয় চাকরিটিতে কিন্তু তিনি পাবেন ৩০০৫ টাকা (পনের দিনের দিন ১৫০০ টাকা, আর মাসের শেষে ১৫০৫ টাকা)। দ্বিতীয় মাসে প্রথম চাকরিতে পাওয়া যাবে ৩০২০ টাকা, দ্বিতীয় চাকরিতে ৩০২৫ টাকা (১৫১০ যোগ ১৫১৫)। বলাবাহুল্য, দ্বিতীয় চাকরিটাই ভাল। পাঠকদের কথা জানি না, আমার কিন্তু সমস্যাটা পড়ে মনে হয়েছিল যে, প্রথম চাকরিটাই শ্যামবাবুর নেওয়া উচিত!

'জুতো আবিষ্কার' বা শিম্পাঞ্জী-মনোবিজ্ঞানীর গল্পে আমরা দেখেছি যে, অনেক সমস্যা রয়েছে যার একাধিক সমাধান সম্ভব। সমাধানকারীর কাজ হবে ভাবনাচিন্তা করে খুঁজে বার করা সমস্যার সহজতম সমাধানটিকে। উদ্ভাবনীশক্তির প্রয়োজন এক্ষেত্রে একেবারে অপরিহার্য। কিন্তু সব সমস্যাতেই যে উদ্ভাবনীশক্তি লাগবে সেটা সত্যি নয়। এমন কঠিন সমস্যা আছে যাতে এই শক্তি এতটুকুও কাজে লাগবে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক: মহারাজ খামখেয়ালী বাহাদুর মনে মনে শূন্য থেকে আট অঙ্কের মধ্যে একটা সংখ্যা ভেবেছেন। কেউ যদি সংখ্যাটা বলে দিতে পারে, তাহলে তাকে দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে-কেউ যতবার খুশি চেষ্টা করতে পারে, তবে প্রতি মিনিটে একবারের বেশি চেষ্টা করা যাবে না। প্রশ্ন হল, কী ভাবে তাড়াতাড়ি দশ লক্ষ টাকা জেতা সম্ভব?

পাঠকদের বলে দিতে হবে না যে, এই সমস্যা সমাধানের কোনও সহজ পদ্ধতি নেই। কেউ যদি শূন্য, এক, দুই, তিন করে পর পর বলে যেতে থাকে, তাহলে এক সময়ে না এক সময়ে তার সংখ্যাটি মহারাজের সংখ্যার সঙ্গে নিশ্চয়

মিলবে। কিন্তু ঠিক কখন, সেটা বলা অসম্ভব। মহারাজ যে সংখ্যাটি ভেবেছেন, সেটা যদি শূন্য হত—তাহলে মুহূর্তের মধ্যে সংখ্যাটি মিলত। কিন্তু মহারাজ যদি ভেবে বসে থাকতেন ৯৯৯৯৯৯৯৯, তাহলে মিলতে মিলতে লেগে যেত দশ কোটি মিনিট, অর্থাৎ প্রায় এক হাজার বছর! এক্ষেত্রে সমাধান পদ্ধতিটি কঠিন নয়, যদিও সমস্যাটি কঠিন।

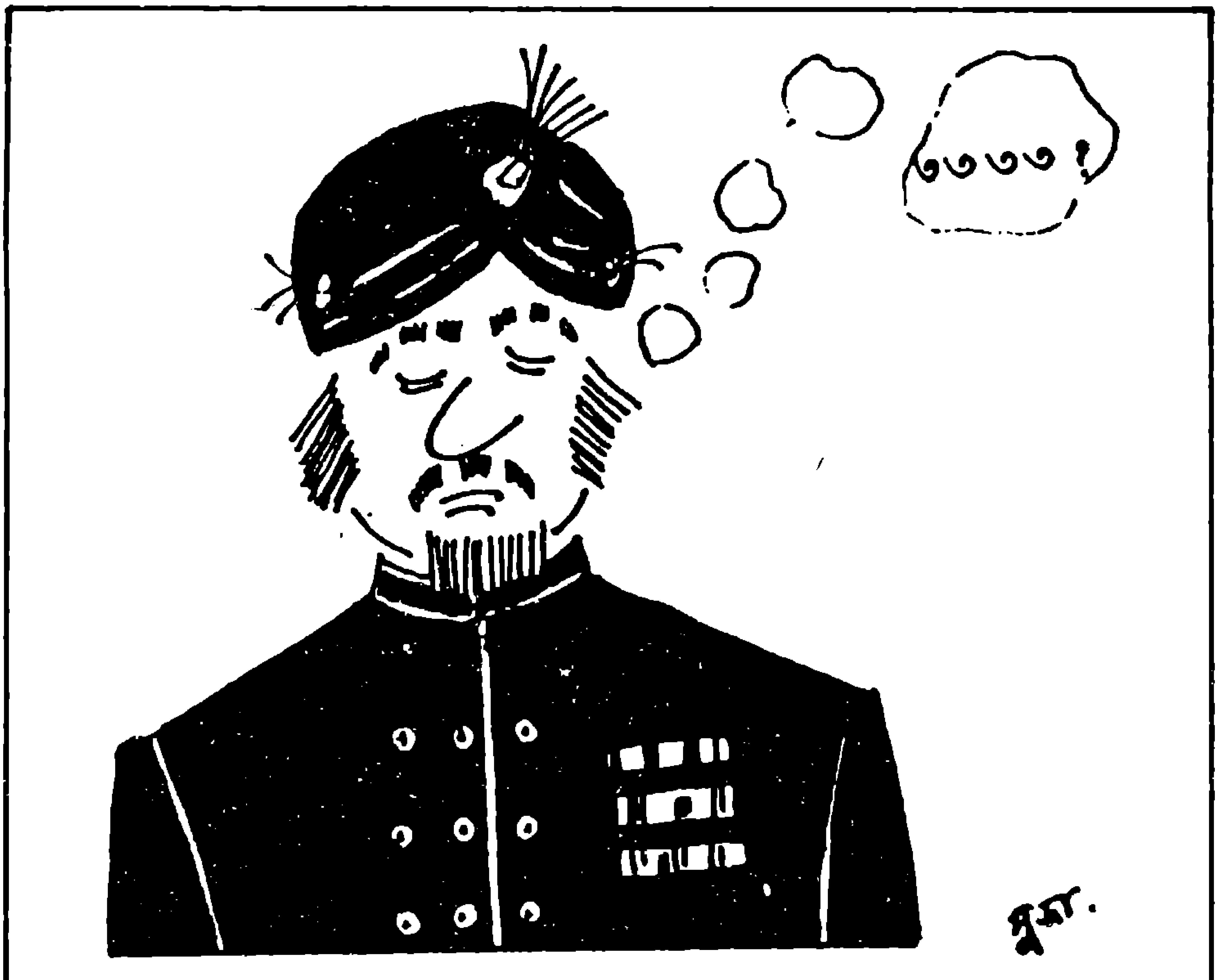

'তিন'-ময় খামখেয়ালি বাহাদুর

এবার ধরা যাক, মহারাজ খামখেয়ালী বাহাদুরের একটা খ্যাপামি ছিল। এ আর নতুন কথা কি, রাজা মহারাজাদের নানান খ্যাপামি থাকে। কিন্তু খামখেয়ালীর খ্যাপামিটা ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের, তিনি ছিলেন ৩-এর অন্ধভক্ত! তাঁর জগতই ছিল 'তিন'-ময়, তিন ছাড়া তিনি আর কিছু ভাবতে পারতেন না। তাঁর ৩ রানী, ৩৩টা প্রাসাদ, ৩৩৩টা মোটর গাড়ি, ৩৩৩৩ ঘোড়া ইত্যাদি। যদি কেউ খামখেয়ালীর এই খ্যাপামির কথা জানতো, তাহলে সে বুঝতে পারত যে, মহারাজার পক্ষে মাত্র আটটি সংখ্যাই ভাবা সম্ভব। এক

অঙ্কের হলে ৩, তিন অঙ্কের হলে ৩৩৩, পাঁচ অঙ্কের হলে ৩৩৩৩৩ ইত্যাদি। অতএব, এক থেকে আট মিনিটের মধ্যেই সে দশ লক্ষ টাকা জিতে নিত! এখানেই আসছে সমস্যা সমাধানের আরেকটা উপকরণের কথা, সেটি হল বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা। খামখেয়ালীর এই খ্যাপামির কথা যারা জানতো না, তাদের পক্ষে এই সমস্যাটির সমাধান করা—বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব। যারা জানতো—তাদের কাছে এটা কোন সমস্যাই নয়। বহু সমস্যা তাই বিশেষজ্ঞরা সহজে সমাধান করেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে যেগুলো চিন্তা করাও কঠিন।

কিছু কিছু সমস্যা আছে বিচার করে দেখতে গেলে বেশ সহজ, সমাধানের জন্য বিশেষ কোন জ্ঞানেরও দরকার নেই—তবু আপাতদৃষ্টিতে তাদের খুব কঠিন মনে হয়—মূলত আমাদের স্মরণশক্তির সীমাবদ্ধতার জন্য। তথাকথিত যুক্তির ধাঁধার কিছু কিছু সমস্যা এই গোত্রে পড়ে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে :

> বিয়ে বাড়িতে তিনবন্ধু সস্ত্রীক নেমন্তন্ন খেতে গেছে। তিনবন্ধু তিন রঙের জামা পরেছে—লাল, নীল ও সবুজ। তাদের স্ত্রীদের শাড়ীর রঙও তিন রকমের—লাল, নীল ও সবুজ। খাবার টেবিলে বসে হঠাৎ লাল রঙের সার্ট পরা ছেলেটি সবুজ শাড়ী পরা বন্ধুপত্নীকে বলল, 'দেখেছো, আমরা তিন বন্ধুর কোনো স্বামী-স্ত্রীই এক রঙের জিনিস পরিনি!'
>
> প্রশ্ন হচ্ছে, সবুজ রঙের শাড়ী পরা মেয়েটির স্বামীর জামার রঙ কি ছিল?

এ ধরনের সমস্যার সমাধান করতে গেলে খাতা পেন্সিল নিয়ে ছক কেটে একটু সুসংবদ্ধভাবে এগোনো দরকার। ছকের ওপর লেখা লাল, সবুজ ও নীল হচ্ছে শাড়ীর রঙ, অর্থাৎ সেগুলো বোঝাচ্ছে স্ত্রীদের। আর ছকের পাশে লেখা লাল, সবুজ ও নীল হচ্ছে জামার রঙ, অর্থাৎ সেগুলো বোঝাচ্ছে স্বামীদের। এই ছকের ঘরগুলোতে ওপর থেকে নিচে নামলে শাড়ীর রঙ এক থাকবে, এক পাশ থেকে অন্য পাশে গেলে জামার রঙ এক থাকবে। এই বিন্যাস অনুসরণ করলে ছকের প্রত্যেকটি ঘর স্বামী-স্ত্রীর ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাবনা বোঝাবে। একেবারে ওপরে বাঁ দিকের ঘরটি বোঝাবে লালশাড়ী-লালজামা, একেবারে নিচে বাঁ দিকের ঘরটি বোঝাবে লালশাড়ী-নীলজামা ইত্যাদি। এখন যেহেতু আমরা জানি যে, স্বামী-স্ত্রীরা এক রঙের জিনিস পরেননি, সুতরাং এক রঙের

	স্ত্রী		
	লাল	সবুজ	নীল
লাল	লাল শাড়ী লাল জামা	সবুজ শাড়ী লাল জামা	নীল শাড়ী লাল জামা
সবুজ	লাল শাড়ী সবুজ জামা	সবুজ শাড়ী সবুজ জামা	নীল শাড়ী সবুজ জামা
নীল	লাল শাড়ী নীল জামা	সবুজ শাড়ী নীল জামা	নীল শাড়ী নীল জামা

সম্ভাবনাগুলো আমরা স্বচ্ছন্দে বিবেচনা থেকে বাদ দিতে পারি (ক)। প্রশ্নে এও বলা আছে যে, সবুজ শাড়ী পরা মেয়েটি লাল সার্ট পরা ছেলেটির বন্ধুপত্নী। অতএব, ছক থেকে সেই সম্ভাবনাটিকেও বাদ দেওয়া হল। এই অবস্থায় লালজামার স্ত্রী একমাত্র নীলশাড়ীর পক্ষেই হওয়া সম্ভব (খ)। এখন যেহেতু নীলশাড়ী লালজামার স্ত্রী, তার পক্ষে আর কারোর স্ত্রী হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং নীলশাড়ী-সবুজজামার ঘরটাও বিবেচনা থেকে বাদ পড়বে। তার অর্থ হল, সবুজজামার স্ত্রী লালশাড়ী ছাড়া আর কেউ হতে পারে না (গ)। বাকি রইল নীলজামা আর সবুজশাড়ী (ঘ), অর্থাৎ তারাই তৃতীয় দম্পতি।

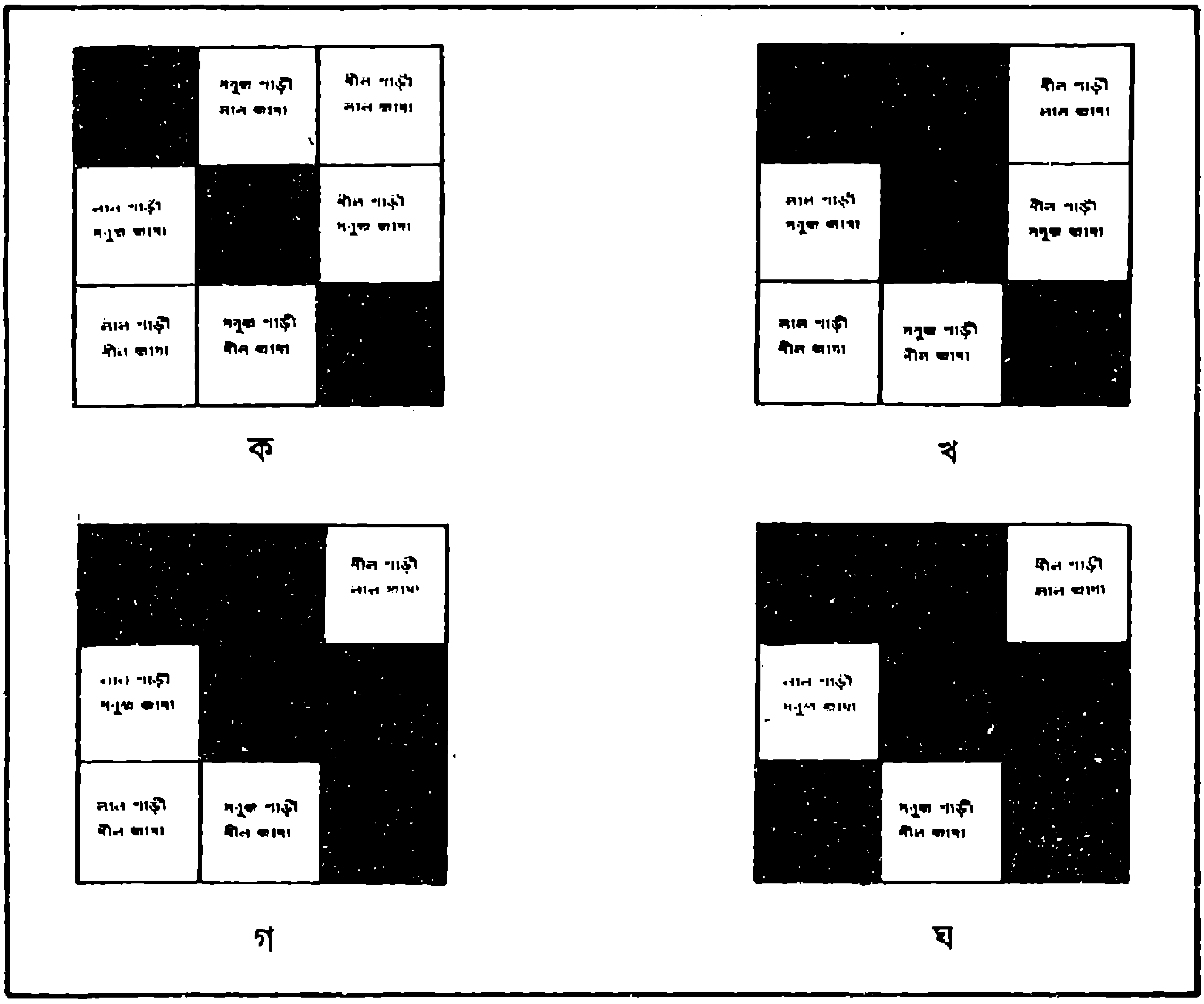

অনেকের হয়তো মনে হতে পারে যে, এই সমস্যার সমাধান তারা ছক ছাড়াই করতে পারতো, তাদের স্মরণশক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য নিচের সমস্যাটি রাখছি।

কমলবাবুর বাড়িতে ছেলেবেলার পাঁচবন্ধু রবীন, গৌরাঙ্গ, বিকাশ, শৈবাল ও অরুণবাবু তাস খেলতে এসেছেন। ছয়বন্ধুর পদবীগুলো হচ্ছে সেন, দত্ত, নন্দী, চৌধুরী, রায় ও দেব। ছয় বন্ধু সম্পর্কে নিচের তথ্যগুলো আমাদের জানা আছে।

(১) কমলবাবু ও শ্রীসেন স্টেট ব্যাঙ্কে কাজ করেন।

(২) কমলবাবু ও শ্রীরায় বালীগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

(৩) শৈবালবাবু ও শ্রীদত্ত কলেজে পড়ান।

(৪) গৌরাঙ্গবাবু ও শ্রীনন্দী ইঞ্জিনীয়ার।

(৫) রবীনবাবু ও অরুণবাবু একসময়ে এরিয়ান্সের হয়ে ফুটবল খেলতেন।

(৬) শ্রীনন্দীর বাইরের খেলাধূলাতে কোনদিনই উৎসাহ ছিল না।

(৭) গৌরাঙ্গবাবুর বোনের সঙ্গে শ্রীদেবের বিয়ে হয়েছে।

(৮) রবীনবাবু ও শ্রীসেন এখনো ভাল তাস খেলতে পারেন না। ওঁরা দুজনেই গৌরাঙ্গবাবু ও শ্রীরায়ের সঙ্গে বসে খেলা শিখছেন।

উপরের তথ্যগুলো থেকে বলতে হবে, কমলবাবু ও তাঁর বন্ধুদের প্রত্যেকের কী পদবী ?

বলা বাহুল্য, উপরের সমস্যাটির কাগজ পেন্সিলে ছক না কেটে করতে পারাটা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব ! আসলকথা চোখের দেখার মত বড় জিনিস আর কিছু নেই। সেইজন্যই কাগজ পেন্সিলের ব্যবহার বা কোন মডেল সামনে রেখে চিন্তা করা—সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে একটা মস্তবড় হাতিয়ার। আমাদের চাকরির উদাহরণটিতেই আবার ফিরে আসি। সমস্যাটা শুনলে বেশির ভাগ লোকেরই মনে হবে প্রথম চাকরিটাই ভাল, কারণ সেখানে প্রতিমাসে ২০ টাকা করে মাইনে বাড়ছে, অন্যটাতে বাড়ছে আধমাস অন্তর ৫ টাকা—অর্থাৎ মাসে মাত্র ১০ টাকা। যাঁদের মনে হবে না, তাঁরা নির্ঘাৎ সন্দেহপ্রবণ লোক, কেউ ধাঁধা জিজ্ঞেস করছে ধরতে পারলেই উল্টো জিনিসটা ঠিক ভাববেন ! সে কথা থাক, কাগজ পেন্সিল নিয়ে ধাপে ধাপে হিসেব না করা পর্যন্ত সমস্যার প্যাঁচটা অনেকেরই চোখে পড়বে না। মনে মনে হিসেব করতে পারাটা অবশ্যই একটা মস্তবড় গুণ, কিন্তু কার্যকারিতার দিক থেকে অনেকক্ষেত্রেই সেটা পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া কাগজ পেন্সিল ব্যবহার করার স্বপক্ষে একটা মস্তবড় যুক্তি রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, অনেক সময়েই নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আমরা সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হয়ে পড়ি। কোনমতে সেই জড়তাটাকে যদি ভাঙা যায়, তাহলে সমাধানের পথটা খুঁজে বার করা খুব একটা কঠিন ব্যাপার হয় না। কাগজ পেন্সিল ব্যবহার করে এই আড়ষ্টতা ভাঙা কিছুটা অন্তত সম্ভব। সমস্যাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে কি তথ্য প্রশ্নে দেওয়া আছে সেগুলো লিখে ফেলা, কী বার করতে হবে সেটা লেখা, এবং উত্তরের যা যা বিধিনিষেধ আছে—তার একটা লিস্ট তৈরি করা—এ সমস্তই সমস্যার খুঁটিনাটিগুলোকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। এর ফলে অনেক সময়ে সমস্যার মধ্যে আমরা অনেক নতুন সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে পারি, সমস্যাকে নতুন আলোয় দেখতে পেতে পারি।

নতুন আলোয় দেখতে পাওয়া বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি, সেটা বিশদ করি। এই পুরনো ধাঁধাটির সঙ্গে নিশ্চয় অনেকে পরিচিত।

ছটি দেশলাই কাঠি দিয়ে চারটি সমবাহু ত্রিভুজ বানাতে হবে, কিন্তু কাঠিগুলো ভাঙা চলবে না।

এই সমস্যাটিতে, উত্তরের ওপর শুধু একটাই নিষেধ আরোপ করা হয়েছে যে, কাঠিগুলো ভাঙা চলবে না। এছাড়া আর কোন বাধ্যবাধকতা কিন্তু নেই। এই শেষের বাক্যটির গুরুত্ব পরিষ্কার হবে, যখন টেবিলে কাঠিগুলো সাজাতে গিয়ে, বা কাগজে লাইন টেনে বিভিন্ন সম্ভাবনাগুলো বিচার করতে গিয়ে আমরা উপলব্ধি করব যে, এই সমস্যার উত্তর এভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ টেবিল বা কাগজের সমতলে এর উত্তর মিলবে না, এর উত্তর হয়তো লুকিয়ে আছে থার্ড ডাইমেনশনে, অর্থাৎ তার জন্য কাঠিগুলোকে টেবিলের ওপরে একটু খাড়া ভাবে দাঁড় করাতে হবে! এটা কিন্তু মস্ত বড় একটা আবিষ্কার। সমস্যার কোথাও বলা হয়নি যে, কাঠিগুলোকে সমতলে রাখতে হবে—এই বিধিনিষেধটা অযথাই আমরা নিজেদের ওপর আরোপ করেছিলাম! তাই বলছিলাম যে, প্রথমেই প্রশ্নটাকে খুব ভাল করে বোঝার চেষ্টা করা উচিত। সেটা করলে অযথা পরিশ্রম অনেক সময়েই কমে। ঐ যাঃ, প্রশ্নের উত্তরটাই তো আর বলা হয়নি! উত্তর হল : টেবিলের ওপর তিনটে কাঠি দিয়ে একটা সমবাহু ত্রিভুজ রচনা করে, তার তিন কোণে আর তিনটে কাঠি দাঁড় করিয়ে—কাঠির অন্য দিকগুলোকে একত্র করলেই চারটি সমবাহু ত্রিভুজ পাওয়া যাবে।

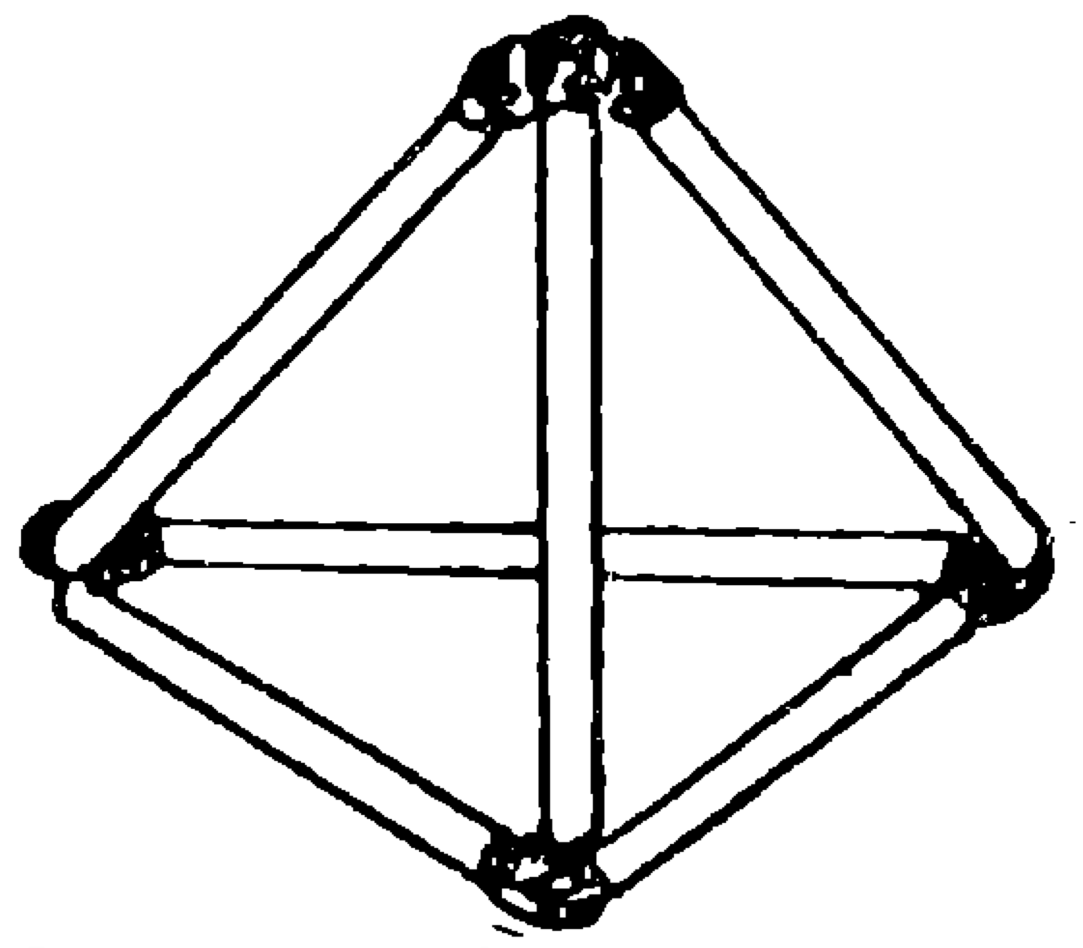

ছটি দেশলাই কাঠি দিয়ে চারটি সমবাহু ত্রিভুজ

নতুন সমস্যা পেলে আমরা প্রথমেই মনে করার চেষ্টা করি—আগে এ ধরনের সমস্যা দেখেছি কিনা। যদি দেখে থাকি তাহলে আর চিন্তা করার দরকার পড়ে না, তাড়াতাড়ি পুরনো জ্ঞানটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। কিন্তু এ ব্যাপারে একটু সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে

সমস্যার সূক্ষ্ম তফাৎগুলো যেন চোখ না এড়িয়ে যায়। যেমন ধরা যাক, কেউ ঐকিক নিয়মটা কি—সেটা ভাল করে জানে। তাকে বলা হল যে, একটা পরোটার এক পিঠ ভাজতে লাগে ২০ সেকেন্ড। যদি ধরা হয় যে পরোটার অন্য পিঠ ভাজতেও একই সময় লাগবে, তাহলে ৭টা পরোটা ভাজতে মোট কতক্ষণ লাগবে ?

এর উত্তর বার করতে সে হিসেব করবে এইভাবে : যেহেতু একটা পরোটার দুটো পিঠ, সুতরাং একটা পরোটা ভাজতে লাগবে ২ × ২০, অর্থাৎ ৪০ সেকেন্ড। তার মানে, ৭টা পরোটা ভাজতে লাগবে ৪০ × ৭, অর্থাৎ ২৮০ সেকেন্ড।

এক্ষেত্রে সে তার ঐকিক নিয়মের জ্ঞানটা ব্যবহার করে সঠিক উত্তর পেয়েছে। কিন্তু তাকে যদি প্রশ্ন করা হত যে, রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' পড়ে শেষ করতে একজনের লাগে ৩ দিন। সেক্ষেত্রে, ৫ জন লোকের 'সঞ্চয়িতা' শেষ করতে কদিন লাগবে ?

এর উত্তরে সে যদি বলতো ৩/৫ দিন, তাহলে সে ঐকিক নিয়মের অপব্যবহার করতো। কারণ ১ জনের বইটি শেষ করতে যত সময় লাগবে, ৫ জনেরও সেই একই সময় লাগবে। অন্য পক্ষে, যদি শুধু একটাই বই থাকত, তাহলে তিনজনের বইটি শেষ করতে ৩ × ৫, অর্থাৎ ১৫ দিন লেগে যেত। বড়দের কাছে এই জিনিসটা সহজবোধ্য হলেও, ছোটরা যারা ঐকিক নিয়ম সবে রপ্ত করেছে—তাদের কাছে এটা মোটেই সেরকম পরিষ্কার নয়।

এবার পরোটার প্রশ্নকে একটু ঘুরিয়ে ভাবা যাক। ধরা যাক, যে তাওয়াতে পরোটা ভাজা হচ্ছে—সেটাতে শুধু একটা নয়, দুটো পরোটা একসঙ্গে ভাজা যায়। এখন ভাজার সময়ের যদি পরিবর্তন না হয়, তাহলে তিনটে পরোটা ভাজতে অন্তত কত সময় লাগবে ?

এ আর এমন শক্ত কি। প্রথম দুটো পরোটা ভাজতে লাগবে ৪০ সেকেন্ড, আর তৃতীয়টা ভাজতে আরও ৪০ সেকেন্ড। অর্থাৎ, মোট ৮০ সেকেন্ড। আপাতদৃষ্টিতে উত্তরটা সঠিক মনে হলেও এতে ভুল আছে। ঠিকমত ভাজতে পারলে তিনটে পরোটা ভাজতে ৬০ সেকেন্ডের বেশি লাগার কথা নয় ! কি করে সম্ভব সেটা একটু ভাবা যাক। ধরা যাক, প্রথমে দুটো পরোটার এক পিঠ ভাজা হল। তার জন্য লাগবে ২০ সেকেন্ড। এবার একটা পরোটা উল্টে দিয়ে, অন্য পরোটাটা তাওয়া থেকে সরিয়ে রেখে সেই জায়গায় তৃতীয় পরোটাকে ভাজতে দেওয়া হল। ২০ সেকেন্ড পরে প্রথম পরোটার দুটো পিঠই

ভাজা হয়ে যাবে। সেটাকে সরিয়ে রেখে, তৃতীয় পরোটাকে উল্টে দিয়ে, দ্বিতীয় পরোটার যে দিক ভাজা হয়নি সেদিকটা তাওয়াতে ভাজতে দিলেই আর ২০ সেকেন্ড বাদে তিনটে পরোটাই ভাজা হয়ে যাবে।*

সমস্যা সমাধানের একটি কার্যকরী উপায় হল একটি জানা তথ্যকে ভিত্তি করে উল্টো দিক থেকে এগোনো। সায়েন্স ও ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্রমহলে এটি 'ব্যাক ক্যালকুলেশন মেথড' বলে সুপরিচিত। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি কার্ডের দোকানে তিন ধরনের কার্ড পাওয়া যায়। বড় কার্ডের দাম ৫ টাকা, মাঝারি কার্ডের দাম ৩ টাকা, আর ছোট কার্ডের দাম ৫০ পয়সা। একদিন দোকানী দেখল যে, সে মোট ৫টা কার্ড বিক্রি করে সেদিন ১৮ টাকা ৫০ পয়সা পেয়েছে। দোকানী ক'টা মাঝারি সাইজের কার্ড সেদিন বিক্রি করেছিল ?

এটাকে যদি সোজাসুজি সমাধান করতে হয়, তাহলে ৫ টি কার্ডের সমস্ত সম্ভাব্য সমন্বয় চিন্তা করে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিক্রির টাকা হিসেব করতে হবে। এই সমন্বয়গুলোর মধ্যে অন্তত একটা ক্ষেত্রে বিক্রির টাকা হবে ১৮ টাকা ৫০ পয়সা। তার থেকেই সম্ভাব্য উত্তর পাওয়া যাবে। এই পদ্ধতিতে কোন গোল নেই, যেটা মুশকিল—সেটা হল ৫টি কার্ডের মোট ২৫টি সমন্বয় বা কম্বিনেশন সম্ভব। সুতরাং বিক্রির অঙ্কগুলো হিসেব করতে কিছুটা সময় লাগবে। বিপরীতপক্ষে, আমরা যদি ১৮ টাকা ৫০ পয়সা থেকে হিসেব শুরু করতাম, তাহলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হত। যেহেতু, বিক্রির পরিমাণ মোট ১৮ টাকা ৫০ পয়সা, অতএব বিজোড় সংখ্যক (১, ৩ বা ৫) ছোট কার্ড নিশ্চয় বিক্রি হয়েছে। ৩ বা ৫-টি কার্ড বিক্রি হওয়া অসম্ভব, কারণ সেক্ষেত্রে বাকি কার্ডগুলো বড় সাইজের হলেও ১৮ টাকা ৫০ পয়সা উঠবে না। অতএব ছোট কার্ডের সংখ্যা ছিল ১।

এখন চিন্তা করা যাক ৪টি বড় কার্ড ও ১টি ছোট কার্ড বিক্রি হলে কত টাকা উঠতো ? ২০ টাকা ৫০ পয়সা,অর্থাৎ বিক্রির টাকার থেকে বেশি। ৩টি বড়, ১টি মাঝারি ও ১টি ছোট কার্ড হলে ? সেক্ষেত্রে হত ১৮ টাকা ৫০ পয়সা—যেটা দোকানী পেয়েছিল। অতএব, ১টি মাঝারি সাইজের কার্ড দোকানী সেদিন বিক্রি করেছিল।

সমস্যা সমাধানের আরেকটি উপায় হল প্রকল্পের ব্যবহার, অর্থাৎ বিভিন্ন

---

* এই ধরনের সমস্যার বিভিন্ন জটিল রূপ আধুনিক গণিতের একটি শাখা 'অপারেশনস রিসার্চ'-এর অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

অনুমানকে ভিত্তি করে কতগুলো প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে আসা। প্রথমে প্রকল্প পদ্ধতির একটা সহজ প্রয়োগ দেখা যাক :

> এক দেশে দুধরনের লোক আছে। একদল সত্যবাদী, আরেকদল মিথ্যেবাদী। সত্যবাদীরা সবসময়ে সত্যি কথা বলে, আর মিথ্যেবাদীরা মিথ্যা। সেদেশে বেড়াতে গিয়ে এক ভদ্রলোকের দুজনের সঙ্গে দেখা হল। ভদ্রলোক তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি সত্যবাদী না মিথ্যেবাদী ?"
>
> উত্তরে লোকটি বিড়বিড় করে ঠিক কি বলল, ভদ্রলোক শুনতে পেলেন না। কিন্তু উত্তরটা দিয়েই লোকটা চলে গেল। ভদ্রলোক তখন তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, আমার প্রশ্নের উত্তরে উনি কি বললেন বলুন তো ?"
>
> সঙ্গী উত্তর দিল, "ও বলে গেল যে ও একটা মিথ্যেবাদী।"
>
> প্রশ্ন হচ্ছে, সঙ্গীটি কী ধরনের লোক ?

প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে প্রথমে অনুমান করা যাক যে, প্রথম লোকটি ছিল সত্যবাদী। সেক্ষেত্রে ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে সে নিজেকে সত্যবাদী বলেই পরিচয় দিত। এবার অনুমান করা যাক যে, লোকটি ছিল মিথ্যেবাদী। সেক্ষেত্রেও তার উত্তর কিন্তু একই হত, কারণ মিথ্যেবাদীরা সবসময়েই মিথ্যেকথা বলে। এর মানে দাঁড়াল, প্রথম লোকটা সত্যবাদী কিংবা মিথ্যেবাদী যাই হোক না কেন, নিজেকে সে সবসময়েই সত্যবাদী বলে পরিচয় দিত। যেহেতু দ্বিতীয় লোকটি বলেছিল যে, প্রথম লোকটি নিজেকে মিথ্যেবাদী বলেছে—তার মানে দ্বিতীয় লোকটিই ছিল মিথ্যেবাদী।

এবার প্রকল্প পদ্ধতির আরেকটা প্রয়োগ দেখা যাক।

> তিনজন বুদ্ধিমান লোককে একজনের পেছনে একজন করে চেয়ারে বসানো হল। যে পেছনের চেয়ারে বসে আছে সে সামনের দুজনের মাথা দেখতে পাচ্ছে। যে মাঝের চেয়ারে বসে আছে সে শুধু সামনের লোকটির মাথা দেখতে পাচ্ছে। আর যে একদম সামনে বসে আছে, সে কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না। এবার তাদের চোখ বন্ধ করতে বলে বলা হল যে, তিনটে সাদা ও দুটো কালো টুপির মধ্যে তিনটে টুপি বেছে তাদের মাথায় পরানো হচ্ছে। টুপি পরাবার পর অন্য টুপিগুলো সরিয়ে তিনজনকে চোখ খুলতে বলা হল। এবার পেছনের লোকটিকে

জিজ্ঞেস করা হল, সে নিজের মাথার টুপির রঙ বলতে পারবে কিনা। সে উত্তর দিল, "না"। মাঝের জনকেও সেই একই প্রশ্ন করা হল। সে উত্তর দিল, "না"। এবার সামনের জনকে প্রশ্ন করা হল। সে বলল, "হ্যাঁ"। তারপর নিজের টুপির রঙ সে ঠিক ঠিক বলে দিল!

টুপি মাথায় তিন বুদ্ধিমান

প্রশ্ন হল, তার টুপির রঙ কী ছিল, আর সে সেটা জানলোই বা কী করে?

উত্তর হচ্ছে, 'সাদা'। আর সেই উত্তরটা খুঁজে বার করতে প্রথম লোকটি চিন্তা করেছিল এইভাবে: ধরা যাক, আমার ও মাঝের লোকটির টুপির রঙ হচ্ছে কালো। সেক্ষেত্রে পেছনের লোকটি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারতো যে, তার টুপির রঙ হচ্ছে সাদা, কারণ পাঁচটি টুপির মধ্যে মাত্র দুটি টুপি কালো রঙের ছিল। যেহেতু পেছনের লোকটি নিজের টুপির রঙ বলতে পারেনি, তার মানে সে তার সামনে হয় দুটো সাদা টুপি, অথবা একটা সাদা ও একটা কালো টুপি দেখতে পাচ্ছে। এখন ধরা যাক, আমার টুপিটা হচ্ছে কালো। সেটা যদি সত্যি হয়—তাহলে মাঝের লোকটি নিঃসন্দেহে ধরতে পারতো যে, তার টুপির রঙ কালো হতে পারে না। কারণ, তাই যদি হত তাহলে সামনের দুটো টুপির রঙই হত কালো এবং পেছনের লোকটি নিজের টুপির রঙ বলে দিতে পারতো। এখন যেহেতু মাঝের লোকটিও নিজের টুপির রঙ বলতে পারেনি, তার মানে আমার টুপির রঙ কলো নয়, সেটা হচ্ছে সাদা।

ওপরের ধাঁধাটি 'ক' সংখ্যক লোকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যদি 'ক' সংখ্যক সাদা ও '(ক −১)' সংখ্যক কালো টুপি থাকে। ক = ৪, অর্থাৎ চারজন লোকের ক্ষেত্রে প্রমাণটা কঠিন নয়। এ ক্ষেত্রেও প্রথমজন চিন্তা করবে এইভাবে: ধরা যাক, আমার টুপির রঙ হচ্ছে কালো রঙের। সেটা দেখে পেছনের তিনজন

জানবে যে, মাত্র দুটো কালো টুপি তাদের জন্য বাকি রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্নটা ঠিক আগের তিনজনের সমস্যার মতই হয়ে যাবে। অর্থাৎ, সবচেয়ে পেছনে দুজন যদি বলে 'না', তাহলে আমার ঠিক পেছনের জনকে বলতে হবে 'হ্যাঁ' (আগের সমস্যার মত)। কিন্তু আমার ঠিক পেছনের জনও যদি বলে 'না', তাহলে আমাকে বুঝতে হবে যে, নিজের টুপির রঙ সম্পর্কে যেটা অনুমান করেছিলাম তা ভুল, আমার টুপির রঙ আসলে সাদা।

ওপরের আলোচনা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হচ্ছে যে, অনেক সময়েই কঠিন সমস্যার আগে তার সহজতর রূপটি নিয়ে চিন্তা করাটা ভাল।

ধাঁধা বা সমস্যার সমাধানে বিশ্লেষণী শক্তিটা আমাদের খুবই কাজে লাগে। অনেক সমস্যা আছে যেগুলো প্রথমে পড়ে মনে হয় যে, এগুলোতে নির্ঘাৎ কোন গলদ আছে, সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য নিশ্চয় দেওয়া হয়নি! তারপর নানান ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে করতে অবশেষে সমাধানের সূত্রটা আমাদের নজরে আসে। এ প্রসঙ্গে একটা ধাঁধার কথা বিশেষভাবে মনে পড়েছে। এটি আমি শুনেছিলাম বছর দশেক আগে একটি দক্ষিণ ভারতীয় ছাত্রের কাছে। ধাঁধাটির আপাত-অসম্পূর্ণতা আমাকে এত মুগ্ধ করেছিল যে, আমি আমার একটি বাংলা বইয়ে এটি ব্যবহার করি। কথা প্রসঙ্গে ধাঁধাটির কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম আই. বি.এম-এর গবেষক রামমূর্তি ভাস্করের কাছে। তিনি আবার সেটি বলেছিলেন কগনিটিভ সাইকোলজির বিখ্যাত গবেষক ডিক হেজ-কে। ডিক হেজ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রব্লেম সলভিং-এর একটি বইয়ে এটি অন্তর্ভুক্ত করেন। মূল ধাঁধাটি অবশ্য আমি পরে আবিষ্কার করেছিলাম—একটি পুরনো বৃটিশ বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে! সেকথা থাক, আগে ধাঁধাটা বলি :

> আমেরিকাতে হ্যান্ডশেক করার চলটা আজকাল কমতির দিকে—এই কথাটির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা তার অনুসন্ধান করছিলেন অধ্যাপক রিচার্ডসন। কোন পার্টিতে গেলেই তিনি তাঁর নোটবুকে টুকে ফেলতেন যে কতবার হ্যান্ডশেক করলো। একদিন অধ্যাপক রিচার্ডসন একটি ছোট পার্টিতে গিয়েছিলেন যেখানে তিনি ও তাঁর স্ত্রী ছাড়া আরও চারটি দম্পতি ছিলেন। পার্টি শেষ হবার আগে যথারীতি নোটবুক বার করে রিচার্ডসন সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন যে, কতবার পার্টিতে হ্যান্ডশেক করেছেন। উত্তরগুলো টুকে দেখলেন যে শূন্য থেকে আট পর্যন্ত সবগুলো সংখ্যাই সেখানে রয়েছে। অর্থাৎ, একজন একবারও হ্যান্ডশেক করেননি, একজন করেছেন মাত্র একবার, একজন দুবার,

ইত্যাদি। এখন আমরা জানি যে, সকলেই অধ্যাপককে সঠিক জবাব দিয়েছিলেন এবং আরও জানি যে, স্বামী ও স্ত্রী একে অন্যের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেন না। প্রশ্ন হল, অধ্যাপক রিচার্ডসনের স্ত্রী ঠিক কতজনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেছিলেন ?

এই ধাঁধাটি প্রথম শুনলে প্রায় সবারই মনে হবে যে, এর কোন উত্তর নেই। কিন্তু সমস্যাটা একটু একটু করে বিশ্লেষণ করলে উত্তরটা আচমকাই স্পষ্ট হবে। শ্রীমতী রিচার্ডসন হ্যান্ডশেক করেছিলেন মোট চারবার। সেটা প্রমাণ করা যাবে এইভাবে :

পার্টিতে সব মিলিয়ে ছিলেন ১০ জন। এক্ষেত্রে একজন লোকের পক্ষে (ধরা যাক তিনি পুরুষ) ৮ বারের বেশি হ্যান্ডশেক করা সম্ভব নয়, যেহেতু তিনি নিজের সঙ্গে এবং নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কখনো হ্যান্ডশেক করেন না। আমরা জানি যে, প্রশ্ন অনুসারে একজন ৮ বার ও একজন শূন্যবার হ্যান্ডশেক করেছেন। সুতরাং, যে ভদ্রলোক ৮ বার হ্যান্ডশেক করেছেন, তাঁর স্ত্রীই হবেন সেই জন—যিনি একবারও হ্যান্ডশেক করেননি (কারণ আর সবাই উপরোক্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেছেন)। এখন আমরা ৮ বার ও ০ বার হ্যান্ডশেক করেছেন যে-দম্পতি, তাঁদের আলোচনা থেকে বাদ দেব। তাহলে বাকি থাকবে চারটি দম্পতি। উপরের যুক্তিগুলো ব্যবহার করলে সহজেই দেখা যাবে যে, এঁরা নিজেদের মধ্যে ৬ বারের বেশি হ্যান্ডশেক করতে পারেন না, এবং এঁদের মধ্যে কোন ভদ্রলোক যদি ৬ বার হ্যান্ডশেক করে থাকেন, তাহলে একমাত্র তাঁর স্ত্রীর পক্ষেই ০ বার হ্যান্ডশেক করা সম্ভব। এখন এই দলের সকলেই প্রথম দম্পতির পুরুষটির সঙ্গে ১ বার হ্যান্ডশেক করেছেন। অতএব দ্বিতীয় দম্পতির মোট হ্যান্ডশেকের সংখ্যা হবে ৭ এবং ১। অনুরূপভাবে দেখা যাবে যে, তৃতীয় দম্পতির হ্যান্ডশেকের সংখ্যা হবে ৬ ও ২, চতুর্থ দম্পতির ৫ ও ৩, এবং পঞ্চম দম্পতির ৪ ও ৪। এই সংখ্যাগুলো পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে যে, একমাত্র অধ্যাপক রিচার্ডসন ও তাঁর স্ত্রীর পক্ষেই পঞ্চম দম্পতি হওয়া সম্ভব, কারণ শুধু সেই ক্ষেত্রেই অধ্যাপক তাঁর প্রশ্নের উত্তরে ০ থেকে ৮ পর্যন্ত প্রত্যেকটি সংখ্যা পাবেন। অতএব, শ্রীমতী রিচার্ডসন মোট ৪ বার হ্যান্ডশেক করেছিলেন।

সমস্যা শোনামাত্র ভাবনাচিন্তা শুরু না করে, প্রথমে সেটি ভাল করে বোঝার প্রয়োজনীয়তার কথা আগেই বলেছি। সেটি না করলে যুক্তির অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা খুবই বেশি। তারই একটি উদাহরণ দিয়ে আলোচনাটা শেষ করছি।

বার বার দ্রোণাচার্যের কাছে মূর্খ বলে অপমানিত হয়ে ভীম ঠিক করলেন যে, যুক্তিশাস্ত্র তিনি গুলে খাবেন। রাজপ্রাসাদের লাইব্রেরীতে যুক্তিশাস্ত্রের ওপর যত বই ছিল তার প্রত্যেকটি তিনি আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেললেন। খবরটা দ্রোণাচার্যের কানে যেতে তিনি ভীমকে

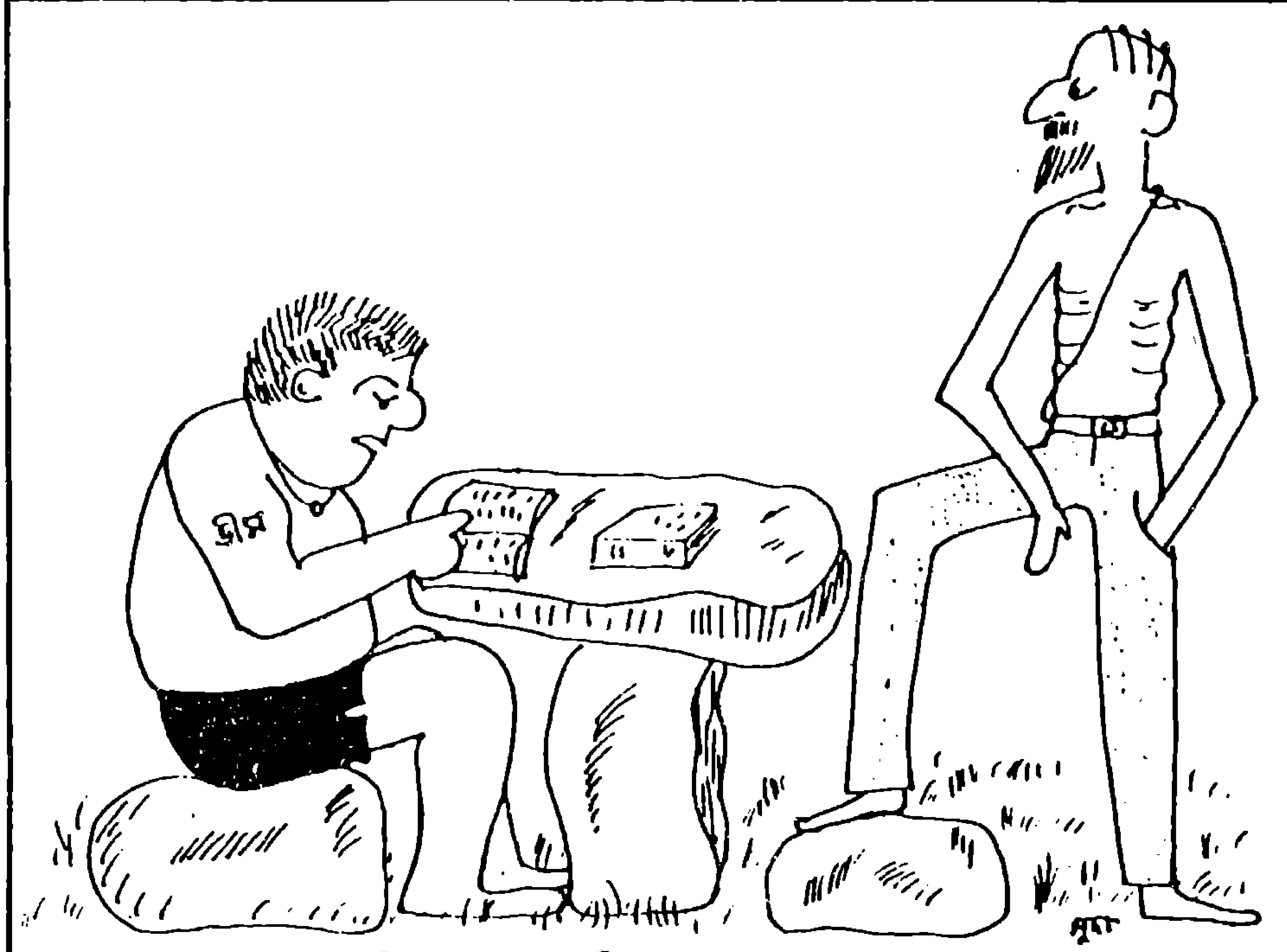

যুক্তিশাস্ত্রজ্ঞ (?) ভীম ও অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য

বললেন, 'বৎস, তোমার অধ্যবসায় দেখে আমি প্রীত হয়েছি। কিন্তু শুধু বই মুখস্থ করলেই তো চলবে না, তার সারটুকুও গ্রহণ করতে হবে।' ভীম গর্বভরে বললেন, 'গুরুদেব, আমি বইয়ের সার অসার সবকিছুই হজম করেছি। আমি এখন পৃথিবীর যে-কোন বুদ্ধির ধাঁধা সমাধান করতে পারি।'

'তাই নাকি !' এই বলে দ্রোণাচার্য তাঁর জীনস-এর পকেট থেকে লাল ও নীল রঙের দুটো বাক্স বার করে ভীমের সামনে রাখলেন। তারপর বললেন, 'এর মধ্যে একটা বাক্সে একটা সোনার আঙটি আছে। তুমি যদি যুক্তি ব্যবহার করে বার করতে পার যে, কোন বাক্সে আঙটিটা আছে

তাহলে সেটা হবে তোমার পুরস্কার।'

ভীম দেখলেন দুটো বাক্সেই একটা করে নোটিস লাগানো। লাল বাক্সের নোটিসে লেখা, 'আঙটি এই বাক্সে নেই।' নীল বাক্সে লেখা, 'লাল এবং এই বাক্সের নোটিসের মধ্যে কেবল একটা হল সত্যি।' কিন্তু ভীম তাতে ঘাবড়ালেন না। তিনি চিন্তা করলেন এইভাবে :

যদি নীল বাক্সের নোটিসটা সত্যি হয়, তাহলে লালবাক্সের নোটিসটা মিথ্যে হতে হবে। লাল বাক্সের নোটিস মিথ্যে হওয়া মানে, আঙটি লাল বাক্সে আছে। অন্যপক্ষে, যদি নীল বাক্সের নোটিস মিথ্যে হয়, সেক্ষেত্রে হয় দুটো বাক্সের নোটিসই সত্যি অথবা দুটোই মিথ্যা। কিন্তু দুটো নোটিস সত্যি হওয়া অসম্ভব, কারণ নীল বাক্সের নোটিস সত্যি হতে গেলে, লাল বাক্সের নোটিস মিথ্যা হতেই হবে। অতএব, দুটো নোটিসই মিথ্যা। সুতরাং এক্ষেত্রেও আঙটিকে লাল বাক্সেই থাকতে হবে। এইসব চিন্তা করে ভীম লাল বাক্স খুলে দেখেন, আঙটির টিকিও সেখানে নেই। ভীমের ভুলটা হল কোথায় ?*

এখানেই আসছে সমস্যাটি ঠিকমত বোঝার প্রশ্ন। দ্রোণাচার্য কিন্তু একবারও বলেননি যে, বাক্সে লেখা সংবাদগুলো সত্যি না মিথ্যা। তিনি শুধু বলেছিলেন যে, আঙটিটি দুটো বাক্সের মধ্যে একটাতে আছে। সেটাও ছিল, তবে লাল বাক্সে নয়—নীল বাক্সে ! সুতরাং, বাক্সে লেখা সংবাদগুলোর ওপর নির্ভর করে আঙটির খোঁজ করাটা ভীমের অবশ্যই ভুল হয়েছে। দুটো বাক্সেই যদি লেখা থাকতো যে, আঙটি লাল বাক্সে আছে—তার মানেই কি আঙটিকে লাল বাক্সে থাকতে হবে ? কী মুশকিল, যে-কেউ তো যা-খুশি সেখানে লিখতে পারে ! ভীমের বলা উচিত ছিল যে, নোটিস ঠিক না ভুল জানা না থাকলে—যুক্তি দিয়ে এ সমস্যার সমাধান অসম্ভব। দ্রোণাচার্য সেই উত্তরই যুক্তিশাস্ত্রজ্ঞ (!) ভীমের কাছ থেকে আশা করছিলেন।

এই সমস্যার অবশ্য আরেকটা দিক আছে, সেটা নিয়ে আগে 'আনন্দমেলা'-য় বার কয়েক আলোচনা করেছি। ভীম ধরে নিয়েছিলেন যে, বাক্সগুলোর ওপরে লাগানো নোটিস দুটো হয় সত্যি অথবা মিথ্যা। লাল বাক্সের ক্ষেত্রে এ অনুমানটা ভুল নয়, কারণ আঙটি হয় লাল বাক্সে

* বলাবাহুল্য, মহাভারতের কোথাও এই ঘটনাটির উল্লেখ নেই। অন্যপক্ষে, বহু দৈনন্দিন ঘটনা মহাভারতে স্থান পায়নি, সুতরাং এটা যে ঘটেনি, জোর দিয়ে বলা অসম্ভব।

আছে, অথবা নেই। কিন্তু নীলবাক্সের ক্ষেত্রে এই অনুমানটা ঠিক খাটে না। নীল বাক্সের নোটিস সত্যি কিংবা মিথ্যা—কোনটাই হতে পারে না! তাও আবার কখনো হয় নাকি! নিশ্চয় হয়, এবং সেটা সহজেই প্রমাণ করা যায়:

প্রথমে ধরা যাক নীল বাক্সের নোটিসটা সত্যি, অর্থাৎ দুটো নোটিসের মধ্যে কেবল একটা সত্যি। কিন্তু, আমরা জানি যে লাল বাক্সের নোটিসটা সত্যি হতে হবে, কারণ আঙটিটা নীল বাক্সে আছে। সেক্ষেত্রে নীল বাক্সের নোটিসকে মিথ্যা হতে হয়। অথচ আমরা প্রথমেই ধরেছি নীল বাক্সের নোটিসটা সত্যি। অতএব সেটা হওয়া অসম্ভব!

এবার ধরা যাক, নীল বাক্সের নোটিসটা মিথ্যা। এক্ষেত্রেও লাল বাক্সের নোটিসটা সত্যি। অর্থাৎ, দুটো নোটিসের মধ্যে কেবল একটা সত্যি। কি বিপদ, সেটাই তো নীল বাক্সের নোটিসের বক্তব্য! তার মানে তো নীল বাক্সের নোটিসটাও সত্যি! অথচ আমরা ধরেছি নীল বাক্সের নোটিসটা মিথ্যে। তার মানে এখানেও অসঙ্গতি থাকছে—নীলবাক্সের নোটিস মিথ্যা হওয়া সম্ভব নয়!

বোঝা গেল যে, নীল বাক্সের নোটিস সত্যি কিংবা মিথ্যা—কোনটাই নয়। হঠাৎ এতে ধোঁকা লাগলেও, ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। 'এই বাক্যটি মিথ্যা'—এই সাদামাটা কথাগুলোও সেই একই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে। যদি ধরা যায় যে, বাক্যটি মিথ্যা, তাহলে সেটা সত্যি! যদি ধরা হয়, বাক্যটি সত্যি, তাহলে সেটা মিথ্যা! এটা হওয়ার কারণ হল, "Self reference"। অর্থাৎ, যে-বাক্যে আপন সত্যতা সম্পর্কে কোন কিছু উল্লিখিত হয়—তার সত্যতাবিচার যুক্তিশাস্ত্রের একটি সূক্ষ্ম ও গোলমেলে বিষয়। সহজ সমাধান কিছু নেই।

এই শেষ আলোচনাটি আমাদের একটা দার্শনিক সত্যের মুখোমুখি করে। সেটা হল, সব সমস্যাকে যুক্তির তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে জব্দ করা যায় না। অনেক-কিছু—যা আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নি—সেগুলো অমোঘ সত্য নাও হতে পারে। সমস্যার সমাধানের কাজে নামতে হলে, সেইজন্য মনকে রাখতে হবে স্বচ্ছ ও মুক্ত।

এম. সি. এশারের অসম্ভব ছবি

মার্টিন গার্ডনার 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকায় তাঁর ধারাবাহিক বিভাগে এশারের উডকাট-এর কাজ প্রথম ছাপেন ১৯৬১ সালে। উডকাটের সেই প্রিন্টটি তিনি নিজেই এশারের কাছ থেকে কিনেছিলেন। এশারের হাতের কাজ মার্টিন গার্ডনারের ভাল লাগলেও একটার বেশি ছবি কেনার কথা কিন্তু তিনি ভাবেননি, যদিও সে সময় এশারের বহু উডকাট ও লিথোগ্রাফের অরিজিন্যাল প্রিন্ট খুব সস্তাতেই বিক্রি হত—চল্লিশ, পঞ্চাশ—বড়জোর ষাট ডলারে। এরপর একযুগও পার হয়নি, সেইসব 'অল্পদামী' ছবি যখন হাজার হাজার ডলারেও পাওয়া যাচ্ছে না, তখন মার্টিন গার্ডনার আফশোস করেছিলেন, কেন তিনি গোড়াতেই অনেকগুলো ছবি কিনে রাখেননি ! কিন্তু, ১৯৬১ সালে কে কল্পনা করতে পেরেছিল এশারের খ্যাতি এত তাড়াতাড়ি এভাবে ছড়িয়ে পড়বে !

কেন এশার হঠাৎ এরকম জনপ্রিয় হয়ে গেলেন, সেটা অবশ্যই একটা প্রশ্ন। তবে এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আছে কিনা, আমার অন্তত জানা নেই।

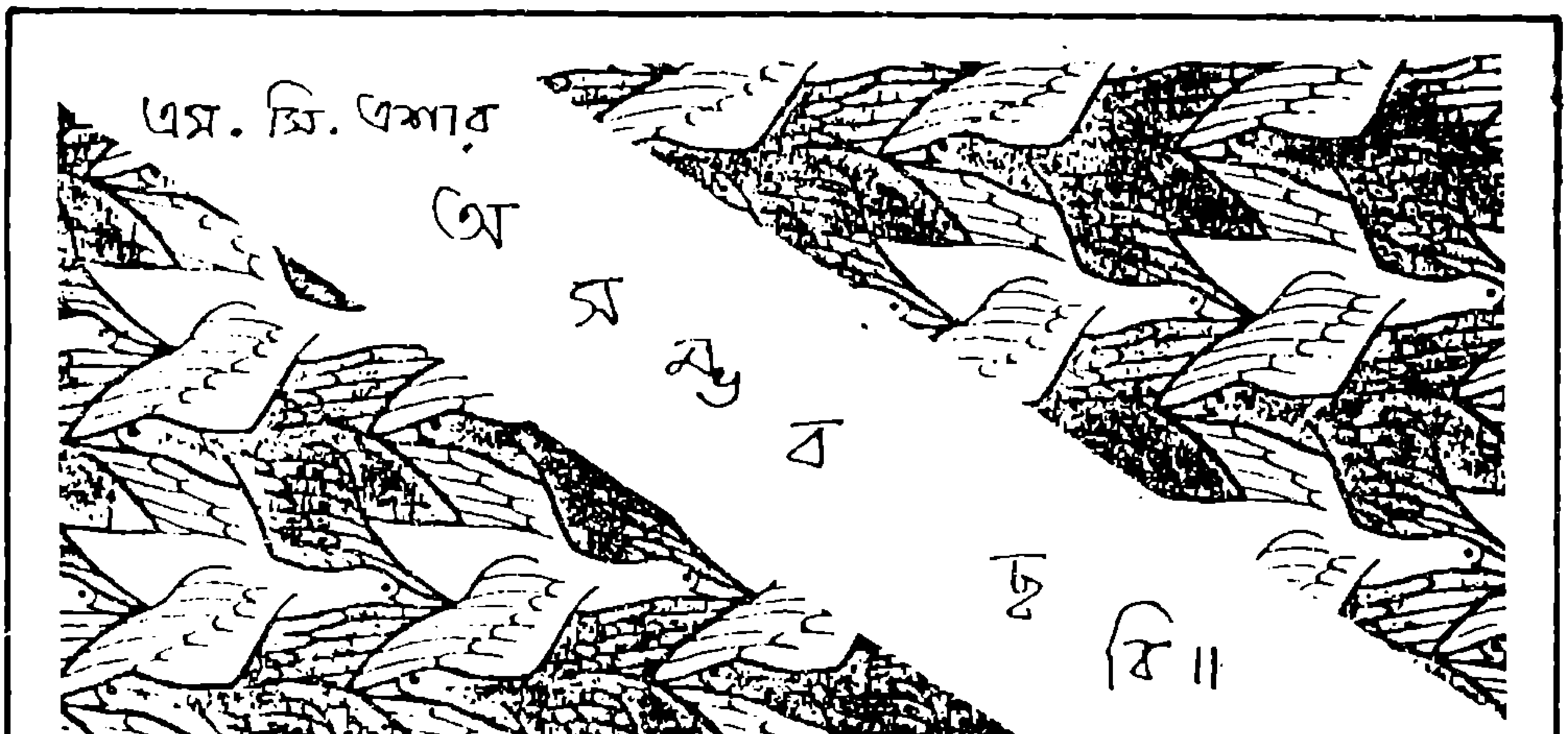

যদি সত্যিই থেকে থাকে, তাহলে শিল্পজগতের দিগ্‌গজরা অবশ্যই একদিন মাথা ঘামিয়ে সেটা আবিষ্কার করবেন। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে, এশারের ক্ষেত্রে—এশারের পরিচয়ে ছবি নয়, ছবির পরিচয়েই এশার। অর্থাৎ সাধারণ লোক এশারকে যত না চেনে, তারচেয়ে ঢের ঢের বেশি চেনে তাঁর গ্র্যাফিক আর্টকে। আর না চিনে উপায়ও নেই, ক্যালেন্ডারে, ওয়ালপেপারে, বইয়ের মলাটে—ইউরোপ আমেরিকার হেন জায়গা নেই যে, যেখানে এশারের ছবি গিয়ে পৌঁছয়নি। অবশ্য তাতে ক্ষতি কি! সুকুমার রায় তো বলেই গেছেন, 'গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা? গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি—তাই দিয়ে যায় চেনা।' শিল্পীর পরিচয় কি তার শিল্পের মধ্যে দিয়েই নয়? অতি অবশ্য। তবু এশারের ছবি নিয়ে সাতকাণ্ড রামায়ণ ফেঁদে বসার আগে, অন্তত জানা যাক লোকটা ঠিক কে।

মরিট্‌স কর্নেলিস এশার (Maurits Cornelis Escher) ১৮৯৮ সালে নেদারল্যান্ডের লিউওয়ার্ডেন-এ জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক দেখে এশারের বাবা হার্লেম শহরের অধুনাবিলুপ্ত স্কুল অফ আর্কিটেকচার এন্ড অর্নামেন্টাল ডিসাইন-এ এশারকে ভর্তি করে দেন। সেখানে হেসুরান দ্য মেস্‌কিটা-র (Jessurun de Mesquita) কাছে এশার তিনবছর ধরে গ্র্যাফিক আর্ট শেখেন। পড়াশুনো শেষ করে প্রায় বারো বছর (১৯২৩-১৯৩৫) এশার বসবাস করেন ইতালীর রোম শহরে। রোমে থাকাকালীন প্রতি বছরই বসন্তের সময় তিনি দক্ষিণ ইতালীর গ্রামাঞ্চল দেখতে বেরিয়ে পড়তেন। দক্ষিণ ইতালীর পথঘাট তখন খুব একটা সুগম্য ছিল না। ফলে প্রায়ই দূর দূর পথ তাঁকে পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হত। এই সময়টাতে এশার বহু ছবি এঁকেছিলেন। ইতালীর গাছপালা, গ্রামশহর, বাড়িঘর, ইত্যাদি ছিল তাঁর ছবির বিষয়বস্তু, আর বাস্তবধর্মীতা ছিল ছবিগুলোর বৈশিষ্ট্য। ইতিমধ্যে ইতালীতে ফ্যাসিজ্‌মের জোয়ার এসেছে। তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে, ১৯৩৫ সালে পাততাড়ি গুটিয়ে তিনি সুইটজারল্যান্ডে চলে যান। সেখানে বছর দুই এবং ব্রাসেল্‌সের শহরতলীতে বছরচারেক কাটিয়ে এশার ফিরে আসেন তাঁর স্বদেশ—নেদারল্যান্ডে। জীবনের বাকি একতিরিশ বছর—১৯৭২ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানেই কাটান।

১৯৩৭ সালের পর থেকে এশারের জীবনে একটা পরিবর্তন আসে। শহরগ্রাম চষে ছবির মালমশলা সংগ্রহ করার স্পৃহা তাঁর সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়। স্টুডিওর চারদেয়ালের মধ্যেই নিজেকে তিনি আবদ্ধ রাখেন। তাঁর ছবির

বিষয়বস্তুতেও বাস্তবজগত আর প্রতিফলিত হয় না। তার বদলে প্রকাশ পায় শিল্পীর নির্জন চিন্তা আর বল্গাহীন কল্পনার এক অত্যাশ্চর্য রূপ। এ-রূপকে আস্বাদন করা কিন্তু অনেকের পক্ষেই সেদিন সম্ভব হয়নি। কেন, সেকথায় পরে আসছি।

এশারের শিল্পকর্মকে মোটামুটি চারভাগে ভাগকরা চলে। প্রথম ভাগটা ১৯২২ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত, যখন তাঁর শিল্পের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল ল্যান্ডস্কেপ। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তাঁর কাজগুলোকে 'মেটামরফসিস' বা রূপান্তর পর্যায়ের কাজ বলে আখ্যা দেওয়া যায়। এরপর দশ বছর (১৯৪৬-১৯৫৬) তিনি পারস্পেক্টিভ ছবি সৃষ্টির দিকে মন দেন। ১৯৫৬ সালের পরবর্তী ছবিগুলোতে অসীম ও অনন্তের প্রতি এশারের যে চিরকালের মোহ, সেটাই বার বার ফিরে ফিরে এসে ধরা দেয়। এই সময়কার কিছু ছবি পরে 'অসম্ভব ছবি' বলেও পরিচিত হয়।

এই প্রবন্ধে আমরা এশারের প্রথমদিকের সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে, রূপান্তর ও তার পরের পর্যায়ের কাজগুলোকে নিয়েই শুধু আলোচনা করবো। তার একমাত্র কারণ, এশার বলতে আজকে আমরা যা বুঝি—তার মূলে প্রধানত এই ছবিগুলোই রয়েছে। কিন্তু সেই আলোচনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ার আগে, 'ফিগার' ও 'গ্রাউন্ড' সম্পর্কে চট করে দু-একটা কথা বলে নেওয়া যাক।

আমরা যখন কোন কিছু আঁকি বা লিখি, তখন যেটা আমরা দর্শক বা পাঠককে দেখাতে যাচ্ছি—সেটা হল 'ফিগার', আর তার চারপাশের শূন্যস্থানটা

রুবিনে'র 'ফুলদানী-মুখ'

হচ্ছে 'গ্রাউন্ড'। অর্থাৎ এই লেখাটা যখন কেউ পড়ছে, তখন তার কাছে কালো অক্ষরগুলো হচ্ছে ফিগার আর কাগজের সাদা অংশগুলো হল গ্রাউন্ড। সাধারণভাবে গ্রাউন্ড নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না, কারণ গ্রাউন্ডের নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। তার একমাত্র কাজ হল ফিগারকে আমাদের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে সাহায্য করা। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। ডেনমার্কের সাইকোলজিস্ট এডগার রুবিনের উদাহরণটা নেওয়া যাক। এই ছবিতে যদি কালো অংশটাকে ফিগার হিসেবে ধরা যায়, তাহলে নিশ্চয় একটা ফুলদানী দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু মুশকিল হল, এক্ষেত্রে গ্রাউন্ডটা মোটেই বৈশিষ্ট্যশূন্য নয়। কেউ যদি কালোর বদলে সাদা অংশটাকে ফিগার হিসেবে চিন্তা করে, তাহলে সে দেখবে দুটো মুখ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে, মজাটা হচ্ছে যে, ফুলদানী ও মুখ কখনোই একই মুহূর্তে একসঙ্গে দেখা যাবে না। ফুলদানী দেখতে গেলে মুখ দুটো হারিয়ে যাবে, মুখ দুটো দেখতে গেলে ফুলদানীটা।

এই ধরনের ছবি আঁকা যে কত কঠিন, সেটা অনুমান করতে খুব একটা কষ্ট হয় না। কারণ ছবির প্রত্যেকটা রেখা টানার সময়, শুধু রেখা নয়, যেখানে রেখাটি পড়ল না—তার কথাও ভাবতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে, দুদিক থেকেই সেটি অর্থপূর্ণ হল কিনা। প্রায় অসম্ভব এক প্রকল্প। কিন্তু এশার এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন এক অনায়াস দক্ষতায়! রূপান্তর পর্যায়ের বহু উডকাট ও লিথোগ্রাফে ফিগার ও গ্রাউন্ডকে তিনি সমানভাবে কাজে লাগিয়েছেন। শুধু ফিগার-গ্রাউন্ডের ব্যবহারই নয়, এই পর্যায়ের ছবিগুলোতে ফিগার ও গ্রাউন্ডকে স্তরে স্তরে পালটে তিনি অদ্ভুত সব চমকের সৃষ্টি করেছেন। ১৯৩৭ সালের উডকাট 'মেটামরফসিস-১' ছবিতে কতগুলো ঘরবাড়ি ক্রমবিবর্তনের ভেতর দিয়ে একটা চাইনীজ ছেলেতে পরিণত হয়েছে।

ছবিটা দেখতে দেখতে গ্রীকপুরাণের নারসিসাসের গল্পটা মনে পড়া

মেটামরফসিস-১ (১৯৩৭)

স্বাভাবিক। নারসিসাসও পালটাতে পালটাতে একগুচ্ছ ফুলে রূপান্তরিত হয়েছিলেন!

এই পর্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি হচ্ছে 'ডে এন্ড নাইট'। এটিও একটি উডকাট-এর প্রিন্ট, সৃষ্টিকাল ১৯৩৮। ছবিটা দেখলে মনে হয়, কেউ যেন শূন্য থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দৃশ্যটাকে দেখছে। ছবির মাঝখানে তলার দিকের চৌকো জায়গাগুলো অবশ্যই আলদেওয়া চাষের জমি। সেই আলদেওয়া জমি ওপরের দিকে উঠতে উঠতে ভেঙে চুরে গিয়ে ফিগার-গ্রাউন্ডের লুকোচুরি খেলায় সাদা ও কালো পাখিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তার ওপর গেলেই আকাশ। ছবির বাঁদিক থেকে ডানদিকে যেতে গেলে আবার আরেকটা চমক! সেখানে সময় যেন তার ছাপ রেখে চলে গেছে। বাঁদিকে যে শহরে আলোর দিন, ডানদিকে আয়নার প্রতিবিম্ব—সেই একই শহরে কালোরাত্রি।

পারস্পেক্টিভ ছবি সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এশার তাঁর অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় রেখেছেন। একদিক থেকে তিনি অঙ্কশাস্ত্রের ঘনজ্যামিতি ও টোপলজির বিভিন্ন আকারকে নিখুঁতভাবে ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন, অন্যদিকে একই দৃশ্যের বিভিন্ন অংশকে ভিন্ন ভিন্ন 'পয়েন্ট অফ রেফারেন্স' থেকে এঁকে, সেগুলোকে কোলাজ করে বাস্তব-অবাস্তবতার এক রোমাঞ্চকর মহাসঙ্গমের সৃষ্টি করেছেন। লিথোগ্রাফ 'হাই এন্ড লো' (১৯৪৭) এবং 'রিলেটিভিটি' (১৯৫৩) নিঃসন্দেহে এ-পর্যায়ের দুটি শ্রেষ্ঠ ছবি। রিলেটিভিটি ছবিটা নিয়ে এবার একটু আলোচনা

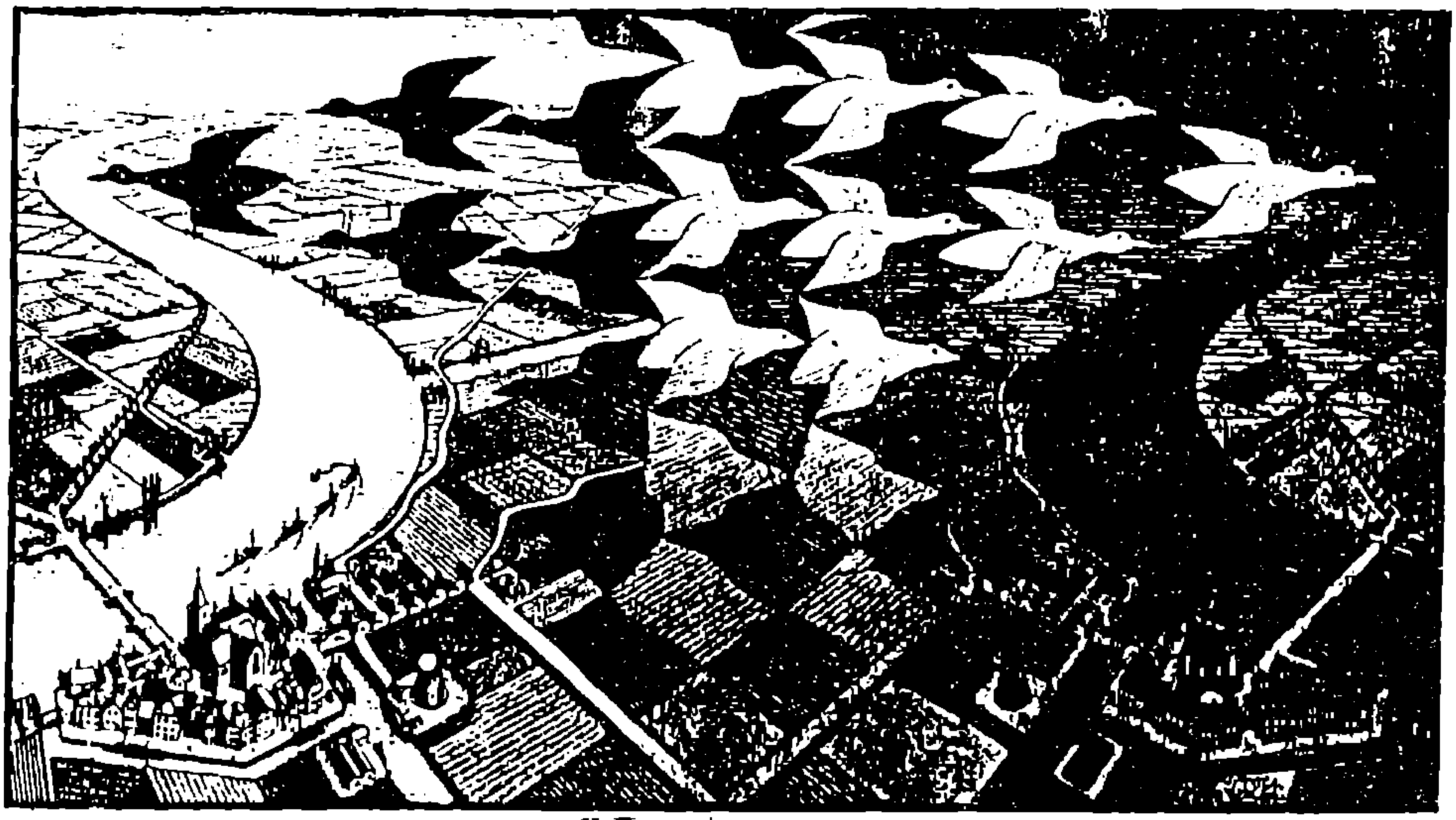

ডে এন্ড নাইট (১৯৩৮)

করা যাক। ছবিটি তিনটি পারস্পেক্টিভ থেকে আঁকা। সেগুলোকে আলাদা করার সহজ উপায় হবে, ছবির ষোলটি লোককে তিনটি দলে ভাগ করা। একটা দলকে আমরা বলবো 'সোজা লোক'—যাদের শরীর খাড়াভাবে রয়েছে। ছবির নিচে মাঝখানের লোকটি হচ্ছে তাদের মধ্যে একজন। একদল লোকের শরীর বাঁদিকে হেলানো, যেমন ছবির নিচে বাঁদিকের লোকটি। তাকে আমরা বলবো 'বাঁলোক'। অনুরূপভাবে তৃতীয় দলটি হচ্ছে 'ডানলোক'।

নিচের সোজালোকটির (এবং অন্যান্য সোজালোকের) কাছে এই ছবিতে একটা বাস্তব জগত রয়েছে। যেমন সেই সোজালোকটি সিঁড়ি দিয়ে তিনপা উঠে, তারপর বাঁদিকের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলেই সোজালোক বাগানের মধ্যে গিয়ে পড়বে। ছবির ওপরে ডানদিকে যে সোজালোকটি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে

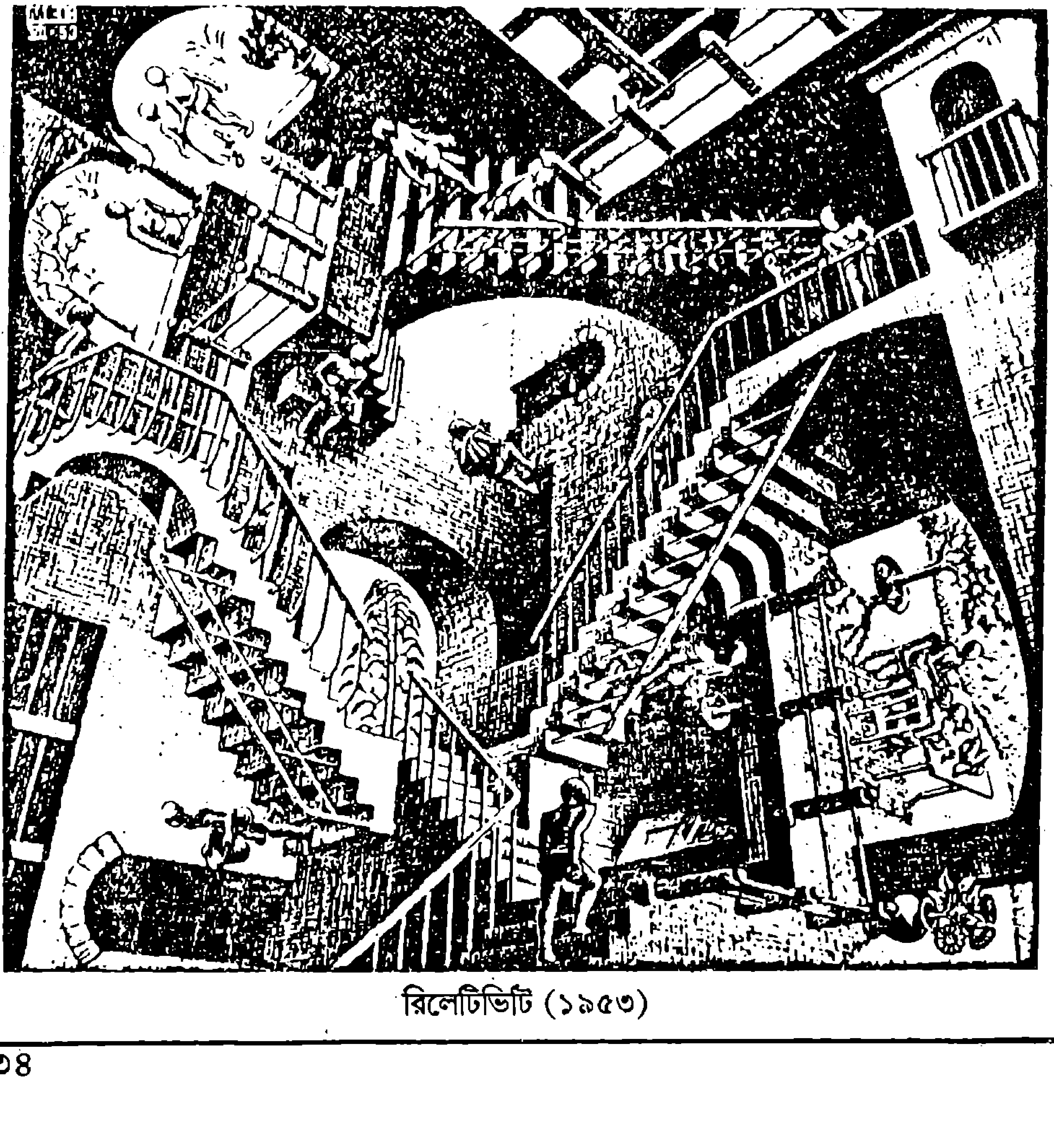

রিলেটিভিটি (১৯৫৩)

আছে, সেও সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজালোকদের বাগানে যেতে পারে। প্রসঙ্গত সে যখন সিঁড়ি দিয়ে নামবে, তখন ডানদিকে পড়বে একটা দেয়াল। সেই দেয়ালটাই আবার বাঁলোকদের কাছে হচ্ছে মেঝে। ছবির নিচে যে বাঁলোকটি আছে, সে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। সেও স্বচ্ছন্দে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে তাদের বাগানে যেতে পারে, বা অন্যদিকের সিঁড়ি ধরে ব্যালকনিতে পৌঁছতে পারে ইত্যাদি। অর্থাৎ, এই ছবিতেই তিন দলেরই বাস্তবজগত আছে ; কিন্তু সবকটা জগতই এক ছবিতে থাকায়, ছবিটা দেখতে এক অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

প্রায় একই সময় আঁকা আরেকটি লিথোগ্রাফ 'ড্রইং হ্যান্ডস' (১৯৪৮) পরে বহু দার্শনিক ও যুক্তিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, ওপরের হাত নিচের হাতকে আঁকছে। কিন্তু সেটা সত্যি হতে পারে না। কারণ, অন্যদিকে তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, নিচের হাতটাই ওপরের হাতকে আঁকছে! কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব, যদি ওপরের হাত নিচের হাতকে আঁকে ?

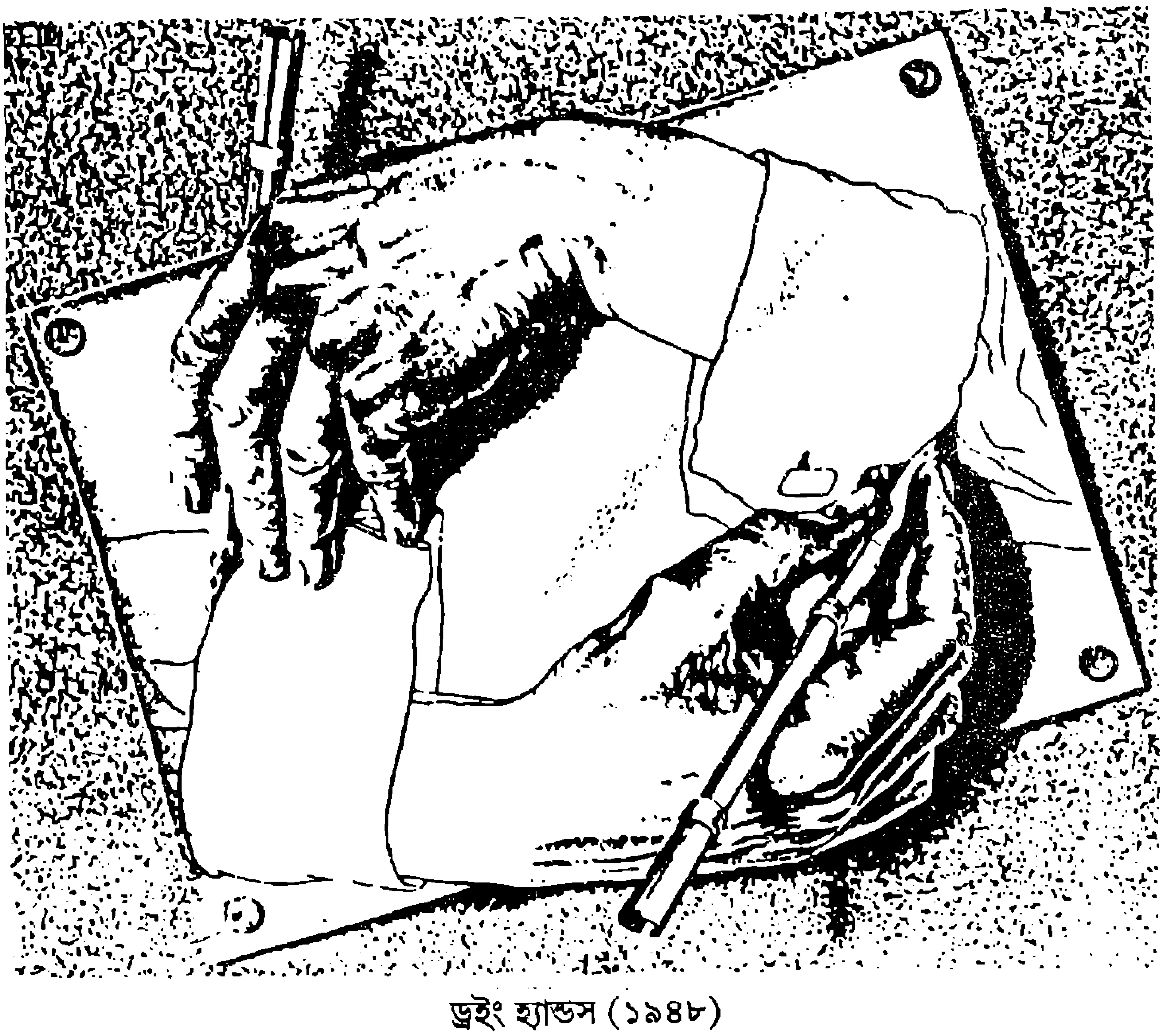

ড্রইং হ্যান্ডস (১৯৪৮)

কে তাহলে আঁকছে ?

নিচের বাক্য দুটি হবে এই ছবিরই ভাষান্তর মাত্র :

নিচের কথাটা সত্যি ।

ওপরের কথাটা মিথ্যা ।

ওপরের কথাটা সত্যি হলে, নিচের কথাটা সত্যি। কিন্তু নিচের কথাটা সত্যি হওয়া মানে, ওপরের কথাটা মিথ্যা। আবার ওপরের কথা মিথ্যে হওয়া মানে, নিচেরটা মিথ্যা। কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার ওপরের কথাটা সত্যি ! তাহলে কোনটে আসলে সত্যি ?

এ ধরনের অদ্ভুত গোলচক্কর এশারের ছবিতে ছবিতে লুকিয়ে আছে। এর সূত্র ধরে অত্যুৎকৃষ্ট এক বই লিখেছেন ডগলাস হফ্স্টেটার। পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত এই বইটির নাম 'গোয়েড়ল, এশার, বাখ্'। তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় নিয়ে সুরু করে—জার্মান গণিতজ্ঞ কার্ট গোয়েড়ল-এর অঙ্ক ও যুক্তির গোলচক্কর নিয়ে গবেষণা, সংগীতজ্ঞ জোহান সিবাস্টিয়ান বাখ্-এর ক্যানন ব্যবহার করে সুরের গোলচক্কর এবং পরিশেষে এশারের ছবির গোলচক্কর—এই তিন তিনটে ধারাকে মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে দেওয়া হয়েছে এই বইয়ে !

এশারের শেষ পর্যায়ের ছবিগুলো নিয়ে আলোচনা করার আগে, তথাকথিত 'অসম্ভব ছবি' সম্পর্কে কিছু বলা প্রাসঙ্গিক হবে। অসম্ভব ছবি বলতে

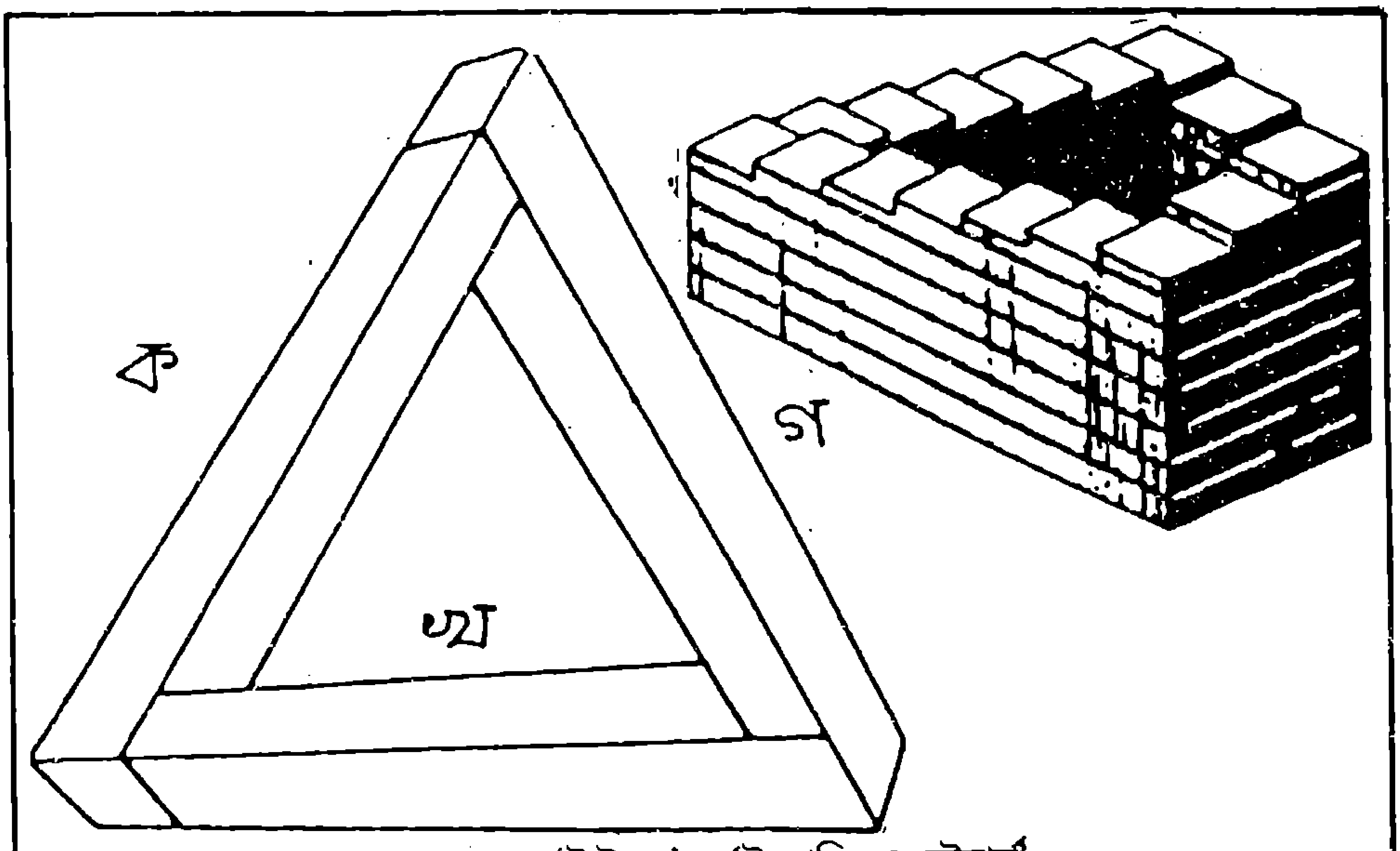

পেনরোজের 'ট্রাইবার' ও 'ইমপসিবল স্টেয়ার্স'

সাধারণভাবে বোঝায় সেই ছবিগুলো যাদের আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় স্বাভাবিক, কিন্তু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে তাদের অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না। অসম্ভব ছবির দুটো বিখ্যাত উদাহরণ হল, 'ট্রাইবার' ও 'ইমপসিবল্ স্টেয়ার্স'। প্রজনন বিজ্ঞানী এল. এস. পেন্‌রোজ ও তাঁর গণিতজ্ঞ পুত্র রজার পেন্‌রোজ ১৯৫৮ সালে 'বৃটিশ জার্নাল অফ সাইকোলজি' পত্রিকায় ছবি

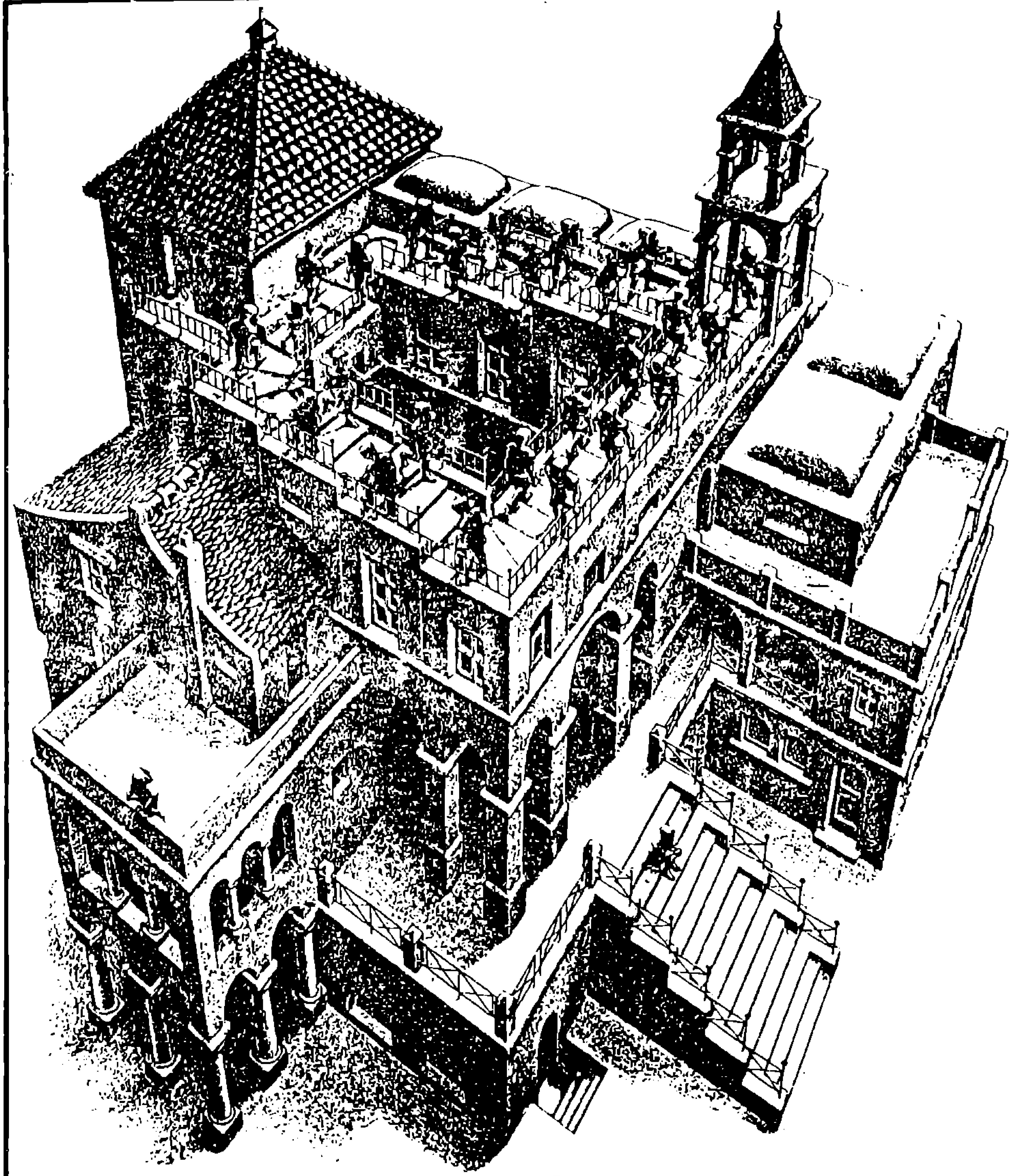

অ্যাসেন্ডিং এন্ড ডিসেন্ডিং (১৯৬০)

দুটোকে প্রথম প্রকাশ করেন।

ট্রাইবার ছবিটার দিকে তাকালে প্রথমে কোনো ত্রুটি চোখে পড়ে না। কিন্তু তিনটে চৌকো লাঠি ক, খ, ও গ-কে কি সত্যিই এমনভাবে জোড়া দেওয়া সম্ভব ? যদি ধরা যায় : ক-র একদিকে খ-কে এবং অন্যদিকে গ-কে জোড়া হয়েছে, তাহলে ছবি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ক-খ, ও ক-গ দুটো সমান্তরাল সমতলে রয়েছে। সুতরাং বাস্তবজগতে খ ও গ-র পক্ষে কখনোই কাছাকাছি আসা সম্ভব নয়, জোড়া লাগা তো দূরের কথা ! তবুও ছবিতে তারা লেগেছে এবং এমনভাবে লেগেছে যে, সেটা দিব্যি স্বাভাবিক লাগছে !

ইমপসিব্‌ল্ স্টেয়ার্সের ক্ষেত্রেও আপাতদৃষ্টিতে আমরা কোনো ত্রুটি দেখি না। তবে একটু খেয়াল করলেই বুঝি, এতে কারসাজি আছে। কারণ এই সিঁড়ি বেয়ে যদি নামতে (বা উঠতে) থাকি, তাহলে খালি নামতেই (বা উঠতেই) থাকবো, তার আর শেষ হবে না ! বাস্তবজগতে সেটা অসম্ভব !

পেন্‌রোজের উদাহরণ দুটো আকর্ষণীয় হলেও, সেগুলো শিল্প নয়। এশারের অসম্ভব ছবি হচ্ছে শিল্প। পেন্‌রোজের 'ইমপসিব্‌ল্ স্টেয়ারকেস'কে এশার কাজে লাগিয়েছেন তাঁর ১৯৬০ সালের লিথোগ্রাফ 'অ্যাসেন্ডিং অ্যান্ড ডিসেন্ডিং'-এ। অসম্ভব ছবির আরেকটা সুন্দর উদাহরণ হল, ১৯৬১ সালের লিথোগ্রাফ 'ওয়াটারফল'। ছবিতে দেখানো হয়েছে যে, ঝরনার জল মাধ্যাকর্ষণ উপেক্ষা করে নিচ থেকে উপরে উঠে, আবার সেখান থেকে ঝরনা হয়ে নিচে নামছে। কিন্তু শিল্পীর ক্ষমতাগুণে এই অসম্ভবটাও মনে হচ্ছে অত্যন্ত স্বাভাবিক !

'অ্যাসেন্ডিং এন্ড ডিসেন্ডিং' ও 'ওয়াটারফল' ছবি দুটোকে যদিও অসম্ভব ছবির উদাহরণ হিসেবে ধরেছি, কিন্তু এর আরেকটা দিকও নিশ্চয় অনেকের কাছে ধরা পড়েছে। দুটো ছবিতেই সীমার মধ্যে দিয়ে অসীমকে ধরে রাখবার একটা চেষ্টা এশার করেছেন। এশারের হাতের গুণে ঝরনার জল কোনোদিন ফুরবে না, আর সিঁড়ি ভাঙাও কখনো শেষ হবে না ! অসীম ও অনন্তের প্রতি এশারের এই তীব্র আকর্ষণ শেষ পর্যায়ের বহু ছবিতেই ধরা পড়েছে, যেমন স্কোয়ার লিমিট, সার্ক্‌ল্ লিমিট, হোয়ার্লপুল ইত্যাদি ছবিতে। এই ছবিগুলোর মূলসুর সবই এক, শুধু টেকনিকের তফাৎ। সবকটিতেই ফিগার ও গ্রাউন্ডের নক্সা ব্যবহার করা হয়েছে, আর বেশিরভাগ সময়েই সেগুলোকে বসানো হয়েছে জ্যামিতির বিভিন্ন আকারের বর্ডারের মধ্যে। তবে নক্সাগুলো শুধু জ্যামিতির নক্সা নয়, তাতে বাস্তব ও কল্পনার অনেক প্রাণীই স্থান পেয়েছে। এই

নক্সাগুলো বড় থেকে কীভাবে সমানুপাতে ছোট হতে হতে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, সেটাই বারেবারে এশার দেখিয়েছেন। ধীরে ধীরে নক্সা ছোট করার কাজ টেকনিকের দিক থেকে মোটেই সহজ নয়। বিশেষত বৃত্তের ক্ষেত্রে (সার্কল্ লিমিট পর্যায়ের ছবিগুলো) নক্সা ছোট করার জন্য এশারকে নন্

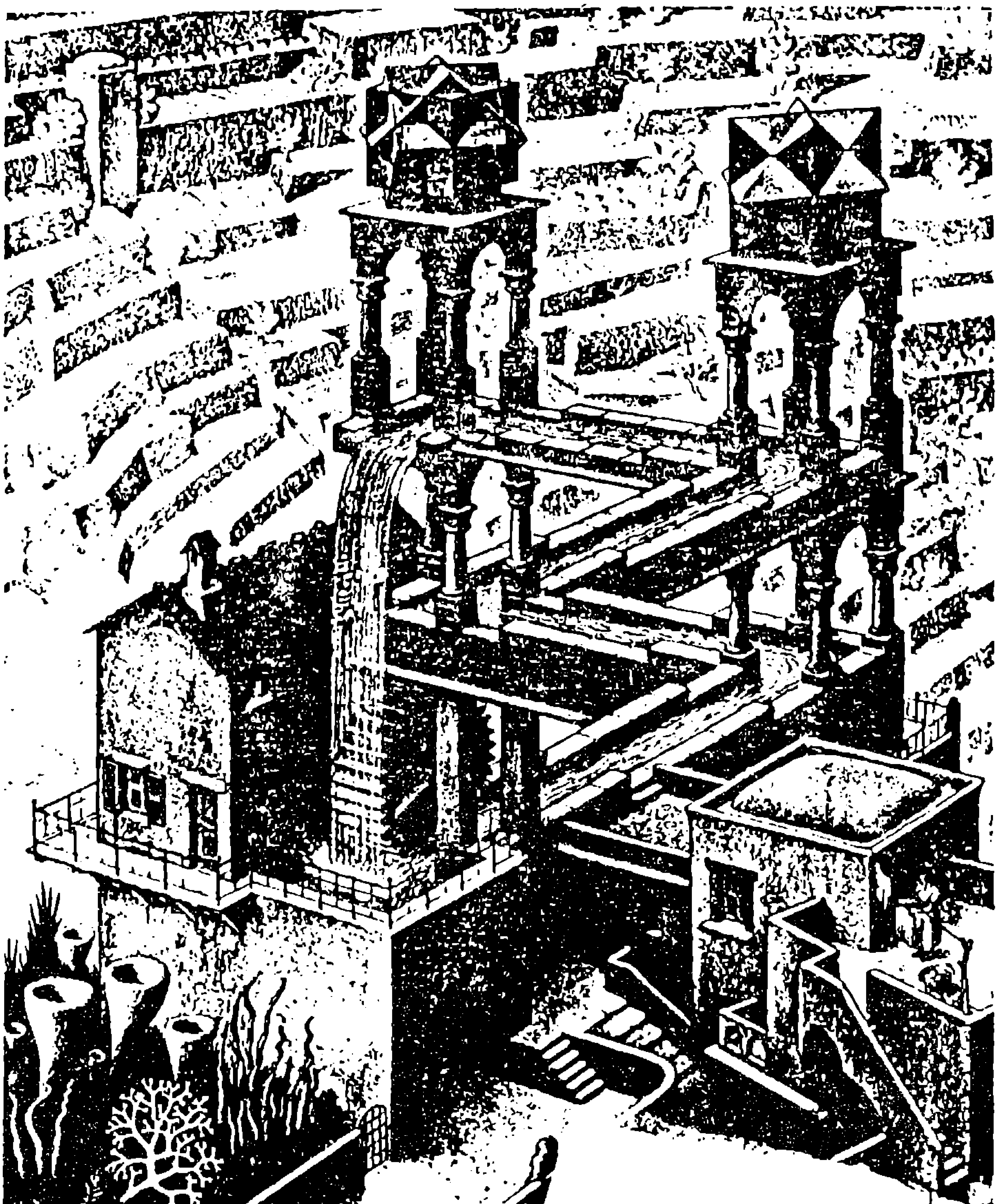

ওয়াটার ফল (১৯৬১)

ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির সাহায্য নিতে হয়েছে। ফ্রান্সের গণিতজ্ঞ জে. এইচ. পয়েন্‌কেয়ার-এর উদ্ভাবিত হাইপারবলিক জিওমেট্রির একটা মডেল ব্যবহার করে এশার এই ছবিগুলোকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

বহুকাল পর্যন্ত শিল্প সমালোচকরা এশারের কাজকে উঁচু চোখে দেখেননি। আসলে এশারের ছবির মাথামুণ্ডু তাঁরা ঠিক খুঁজে পাননি। অনেকে এখনো পান না। গ্র্যাফিক টেকনিকের ব্যাপারে এশারের দক্ষতা কেউ অবশ্য অস্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁর আর্ট হচ্ছে বড় বাড়াবাড়ি রকমের মননধর্মী এবং কাটখোট্টা, আদৌ কাব্যময় নয়। অনেক মডার্ন আর্ট অবশ্য কাব্যময় নয়, কিন্তু সেখানেও এশার কল্কে পাননি। কারণ এশারের শিল্পের মূল কাঠামোটা হচ্ছে সনাতনধর্মী। এশারের প্রতি শিল্পসমাজের এই অবজ্ঞা যে কত গভীর সেটা বোঝা যায়, যখন 'ডেল্টা' পত্রিকা ১৯৬৯-৭০ সালে নেদারল্যান্ডের পঁচিশ বছরের শিল্পকলা নিয়ে একটা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। সেই সংখ্যায় এশারের একটা ছবিও ছাপার যোগ্য বলে মনে করা হয়নি! অথচ, ঠিক ওই একই সময়কালে এশারের অজস্র ছবি দেশবিদেশের পোস্টারে, রেকর্ড কভারে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বইয়ের পাতায় শোভা পেয়েছে।

শিল্পজগতের অবহেলা এশার অবশ্য বিজ্ঞানজগতে সুদে-আসলে পুষিয়ে নিয়েছেন। ১৯৫৪ সালে, যখন আমস্টার্ডমে ইন্টারন্যাশেনাল কংগ্রেস অফ ম্যাথম্যাটিসিয়ানদের কনফারেন্স চলছে, তখন উদ্যোক্তারা এশারের এক শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সেই সূত্রে বহু বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর সঙ্গে এশারের ব্যক্তিগত পরিচয় হয়। পরে এঁদেরই উৎসাহে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক কনফারেন্সে এশার তাঁর শিল্প সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। বহু বিজ্ঞানানুরাগী এভাবেই এশারের কাজের সঙ্গে পরিচিত হন এবং মূলত এই কারণেই এশারের জনপ্রিয়তা প্রথম দিকে সীমাবদ্ধ ছিল বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও বিজ্ঞান যাঁরা ভালোবাসেন—তাঁদের মধ্যে। একসময় আমেরিকাতে এশারের সবচেয়ে বড় সংগ্রহ ছিল কোনো বিখ্যাত আর্ট কালেক্টরের কাছে নয়, কর্ণেলিয়াস রুজভেল্ট নামে এক ইঞ্জিনীয়ারের কাছে। আজ এশারের ছবি বহুলোকেরই প্রিয়। গ্র্যাফিক আর্টিস্টদের মধ্যে এশার নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। মাঝে মাঝে মনে হয়, বিজ্ঞানীরা তাতে নিশ্চয় প্রভূত আনন্দ পান যে, তাঁদের পছন্দসই অন্তত একজন শিল্পীকে তাঁরা বিশ্বপরিচিতি দিতে পেরেছেন!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥ M.C. Escher Heirs C/O Cordon Art-Baarn-Holland, এশারের ছবিগুলো ছাপার অনুমতি দিয়ে লেখককে বাধিত করেছেন।

নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তার চক্কোরে !

বহুদিন আগে দিল্লীর গোলবাজারের পেছনের গলিতে বসে এক ধুরন্ধর বঙ্গসন্তান তরিতরকারি বেচত, আর সেই সঙ্গে একটি মোক্ষম সাইড বিজনেস চালাত। সামনে চটের ওপরে তিনটে তাস উল্টো করে সাজিয়ে রেখে সে বলত যে, তিনটের মধ্যে একটা হচ্ছে কালো রঙের, বাকি দুটো লাল। দর্শকদের আন্দাজ করে বলতে হবে, কোনটা হচ্ছে কালো। বলার আগে অবশ্য পঁচিশ পয়সা জমা রাখতে হবে। ঠিক বললে দ্বিগুণ, অর্থাৎ পঞ্চাশ পয়সা ফেরৎ পাওয়া যাবে, নইলে পঁচিশ পয়সাই গচ্চা। তরকারি কেনার ফাঁকে অনেকেই ওখানে বাজী রাখতো, আর হরদম পয়সা খোয়াত। এক বৃদ্ধ বহুবার হেরে শেষ পর্যন্ত ধরে ফেললেন যে, এই খেলায় জেতা অসম্ভব ! তিনি হুমকি

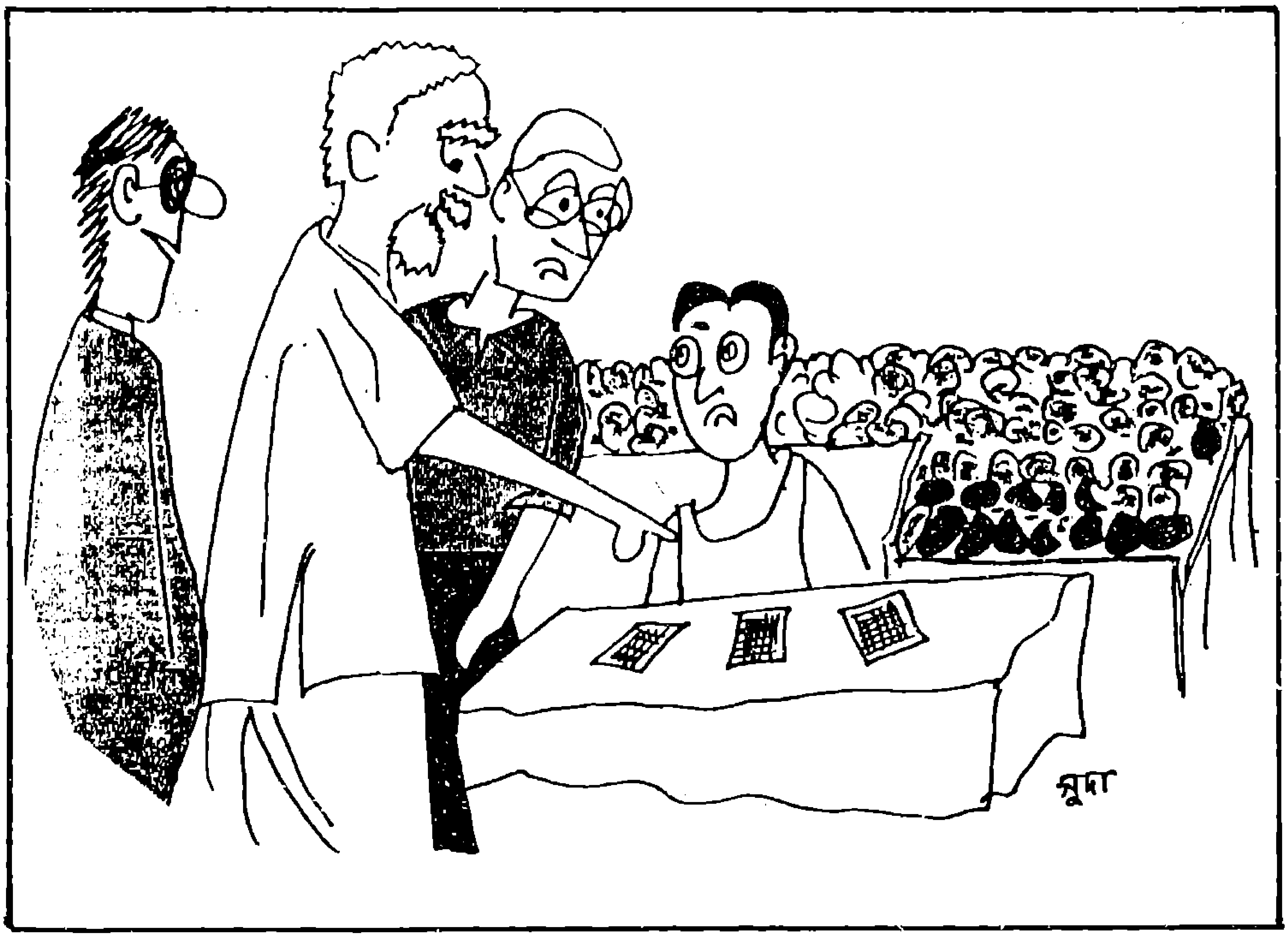

দিয়ে বললেন, ব্যাটা, তুই আমাদের বড্ড ঠকাচ্ছিস ! তিনটে তাসের মধ্যে দুটোই হচ্ছে লাল ; সেগুলো দেখালে তুই জিতবি। কেবল একটা হচ্ছে কালো ; একমাত্র সেটা দেখাতে পারলেই আমি জিতবো। তার মানে তিনের মধ্যে তোর জেতার সম্ভাবনা দুই ; আমার মাত্র এক !

বঙ্গসন্তান দমবার পাত্র নয়। সে বলল, বারে দাদু, সেইজন্যেই তো আমি ডবল পয়সা ফেরৎ দিচ্ছি !

বৃদ্ধ প্রথমে একটু থতমত খেলেও প্যাঁচটা ধরে ফেললেন। বললেন, বদমায়েশির আর জায়গা পাসনি ! আমি হারলে পঁচিশ পয়সা খোয়াচ্ছি, আর তুই হারলে যে-পঞ্চাশ পয়সা আমায় দিচ্ছিস—তার পঁচিশ তো আমার কাছ থেকেই পাওয়া ! এর মধ্যে আবার ডবলের প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে শুনি ?

এই শুনে আশেপাশের সবাই চ্যাঁচামেচি আরম্ভ করল। বঙ্গসন্তান বুঝল যে, ব্যাপারটা মোটেই সুবিধার নয়। এর পর উত্তম-মধ্যম খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সে তড়িঘড়ি বলল, এইবার বুঝেছি ঠাকুদ্দা, আমার একদম খেয়ালই হয়নি সেটা। আচ্ছা, আমি ভুল শুধ্‌রে নিচ্ছি। আপনি আপনার তাসটা আগে বাছুন। তারপর আমি বাকি দুটো থেকে একটা লাল তাস উল্টে দেবো। তাহলে শুধু দুটো তাস বাকি থাকবে। একটা লাল, আরেকটা কালো। সুতরাং আপনার চান্স হবে ফিফটি-ফিফটি।

বলাবাহুল্য, এই নতুন প্ল্যানে বৃদ্ধের জেতার সম্ভাবনা কিন্তু এতটুকুও বাড়ছে না। খেলার সময় সেই তিনটে তাসই থাকছে, এবং সঠিকভাবে কালো তাসটা বাছার সম্ভাবনা ১/৩ ভাগই রয়ে যাচ্ছে ! যদি বৃদ্ধের বাছার আগেই একটা লাল তাস উল্টে দেওয়া হত। তাহলে লাল আর কালো দুটো তাস থাকত এবং খেলাটা হত ফিফটি-ফিফটি চান্সের।

ওপরের গোলমালটা যদি বা আঁচ করা যায় ফরাসী গণিতজ্ঞ জে. বার্ট্রান্ডের (J. Bertrand) বাক্স-সমস্যাটা কিন্তু একেবারে ধাঁধিয়ে দেয়। সমস্যাটা হল, তিনটে বাক্সে দুটো করে মোহর আছে। একটাতে শুধু সোনার মোহর, আরেকটাতে রূপোর। আর তৃতীয় বাক্সে সোনা ও রূপো দুটোই আছে। এখন চোখ বুজে যদি যে-কোন একটা বাক্স বাছা যায়, তাহলে ২/৩ ভাগ সম্ভাবনা যে সেই বাক্সে একই ধরনের মোহর আছে। এটা বুঝতে তেলখড় পোড়াতে লাগে না। কারণ, তিনটে বাক্সের মধ্যে দুটোতেই রয়েছে এক জাতীয় মোহর (সোনা-সোনা বা রূপো-রূপো)। কিন্তু এবার ভাবা যাক যে, বাছা বাক্সটা থেকে একটা মোহর বার করা হল, আর দেখা গেল সেটা হল সোনার। এ থেকে

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বাছা বাক্সটা কখনোই শুধু রূপোর বাক্স নয়। সেটা হয় 'সোনা-সোনা' অথবা 'সোনা-রূপোর' বাক্স। অর্থাৎ, বাক্সটাতে 'সোনা-সোনা' বা এক জাতীয় মোহর থাকার সম্ভাবনা হচ্ছে ১/২ ভাগ। কী মুশকিল! প্রথমে আমরা হিসেব কষে দেখলাম, যে-কোনও একটা বাক্স বাছলে—সেটাতে এক ধরনের মোহর থাকার সম্ভাবনা হচ্ছে ২/৩ ভাগ। অথচ, বাছা বাক্স থেকে একটা মোহর বার করে পরীক্ষা করা মাত্র, সেই সম্ভাবনা কমে হয়ে যাচ্ছে ১/২ ভাগ! ভারি গোলমেলে তো!

অঙ্কে যাদের মাথা খুব সাফ, তারা ওপরের যুক্তি শুনে হাসবে। এর মধ্যে আবার গোল কোথায়? মোট তিনটে সোনার মোহর ছিল। তাদের মধ্যে দুটো ছিল 'সোনা-সোনা' বাক্সে, আর তৃতীয়টা ছিল 'সোনা-রূপো' বাক্সে। সুতরাং বাক্স খুলে সোনার মোহর পেলে অবশ্যই ২/৩ সম্ভাবনা যে, সেটা 'সোনা-সোনা' বাক্স থেকেই বেরিয়েছে। খাঁটি কথা! আসলে প্রবাবিলিটি জিনিসটা এত গোলমেলে যে, একটু অসতর্ক হলেই হিসেবে ভুল হয়ে যায়। মনে আছে স্কুলে অঙ্ক ক্লাসের মাস্টার মশাই একবার প্রশ্ন করেছিলেন যে, যদি তিনটে পয়সা এক সঙ্গে টস করা যায়, তাহলে সব কটার হেড বা টেল হবার কী সম্ভাবনা? আমরা সবাই মুখবুজে মাথা চুলকোচ্ছি। শ্যামলটা ছিল অঙ্কে পণ্ডিত। সে বলল, স্যার ১/২।

হাফ! কী করে?

স্যার, তিনটে পয়সা যখন টস করা হল, তখন দুটোকে অন্তত একইভাবে পড়তে হবে। এখন তৃতীয়টা হয় ওই দুটোর মতই পড়বে, নয় উল্টোভাবে পড়বে। অতএব, ১/২ অর্থাৎ, ফিফটি-ফিফটি চান্স যে তৃতীয়টাও প্রথম দুটোর মত—মানে সবগুলোই একভাবে পড়বে।

আমরা তো সবাই শ্যামলের আর্গুমেন্টে মুগ্ধ! মাস্টারমশাই কোনও কথা না বলে বোর্ডে লিখতে শুরু করলেন যে, কতরকমভাবে পয়সাগুলো মাটিতে পড়তে পারে।

(১) হেড হেড হেড	(৫) টেল হেড হেড
(২) হেড হেড টেল	(৬) টেল হেড টেল
(৩) হেড টেল হেড	(৭) টেল টেল হেড
(৪) হেড টেল টেল	(৮) টেল টেল টেল

তারপর বললেন, এখন এই আটরকম সম্ভাবনার মধ্যে শুধু দুটো ক্ষেত্রে পয়সাগুলো সব একদিক হয়ে পড়ছে। অতএব, সব একদিকে হয়ে পড়ার

সম্ভাবনা হল ২/৮ বা ১/৪ ।

মাস্টারমশাই পরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, শ্যামলের ভুল হয়েছিল সর্টকাট করতে গিয়ে টসের ফলাফলকে পরস্পর-নির্ভরশীল করে ফেলা ! সেইজন্যেই বলছিলাম যে প্রবাবিলিটি হিসেব করার সময় খুব হুঁশিয়ার থাকা দরকার। তবে কিনা প্রবাবিলিটি জিনিসটাই একটু রহস্যময়। একটা পয়সা টস করলে, হেড (অথবা টেল) হবার চান্স নিশ্চয় ফিফটি-ফিফটি ; কিন্তু জোর করে তো বলা যায় না যে, ঠিক কখন 'হেড' পড়বে। পরপর বেশ কয়েকবার 'হেড' নাও পড়তে পারে। শুধু এটুকুই বলা যায় যে, অনেকবার যদি টস করা হয়, তাহলে মোট 'হেড' আর 'টেলের' সংখ্যা খুব কাছাকাছি হবে। এই জিনিসটা ভাল করে বোঝা দরকার। প্রবাবিলিটি হচ্ছে সম্ভাবনা, নিশ্চয়তা নয়। দুই আর দুই যোগ করলে যে, চার হবে সেটা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। কিন্তু দুবার পয়সা টস করলে যে, একবার হেড পড়বে সেটা আমরা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি না। মাঝে মাঝে অবশ্য যেটা নিশ্চিতভাবে বলা চলে, সেটাও অনিশ্চিত বলে বোধ হতে পারে। নিচের সমস্যাটা তার একটা উদাহরণ।

একবার দ্রোণাচার্য ভীমকে মূর্খ বলে তিরস্কার করায় ভীম রেগেমেগে মল্লযুদ্ধ ছেড়ে পড়াশুনোতে মন দিলেন।* পাঁচমাস তেড়ে (যাকে বলা যেতে পারে ভীমবেগে) পড়াশুনো করার পর ভীমের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, বিশ্বের কোনও রহস্যই তাঁর অজানা নেই। তাই একদিন দ্রোণাচার্যকে পাকড়াও করে বললেন, গুরুদেব, সেদিন তো আমায় খুব অপমান করলেন ! এবার দেখি কোন প্রশ্নে আমাকে জব্দ করতে পারেন !

দ্রোণাচার্য এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। বললেন, উত্তম প্রস্তাব। এস আমার সঙ্গে।

দ্রোণাচার্য ভীমকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একপায়া একটা চৌকো টেবিলের সামনে দাঁড় করালেন। বললেন, এই টেবিলটা সাধারণ টেবিল নয়। আমার বানানো নক্সা থেকে জাপানী কারিগর এটা বানিয়েছে। টেবিলের ওপরটা দেখ, একেবারে নিঁখুত, একদিক থেকে অন্যদিকের কোনও তফাৎ নেই। টেবিলের নিচে একটা মোটর আছে, আর আমার হাতের এই ছোট্ট বাক্সটা হচ্ছে একটা রিমোট কন্ট্রোল সুইচ। এটা যতক্ষণ টিপে রাখবো, পায়ার ওপর টেবিলটা ততক্ষণ বাঁই বাঁই করে ঘুরবে। লক্ষ্য করে দেখ যে, টেবিলের

* মহাভারতে এই ঘটনার কথা উল্লেখিত হয়নি। কিন্তু এটা যে ঘটেনি, সেটা কি নিশ্চিতভাবে বলা যায় ?

চারকোণে ঠিক একই রকমের পকেট আছে। পকেটের নিচে যে জায়গা আছে সেখানে শুধু একটা টেনিস বল থাকতে পারে। কিন্তু সেখানে বল আছে কি নেই, সেটা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। জাপানী কারিগরের কেরামতিতে পকেটে ঢুকলেই বল ইনভিজিব্‌ল্‌ হয়ে যায়! পকেটে কোনও বল আছে কিনা সেটা একমাত্র বোঝা সম্ভব, পকেটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে। তোমার কাজ হচ্ছে চারটে পকেটকেই এক অবস্থায় আনা। অর্থাৎ হয় প্রত্যেক পকেটেই বল থাকবে, অথবা কোনও পকেটেই থাকবে না। যখন সব পকেটগুলো এক অবস্থায় আসবে, তখন টেবিলের নিচে লাগানো একটা স্বয়ংক্রিয় ঘন্টা বাজতে শুরু করবে—আর তুমিও বুঝবে যে, তুমি সফল হয়েছ।

ভীম বললেন, গুরুদেব আপনি আমার সঙ্গে ডাহা রসিকতা করছেন। এটা আবার কোনও কাজ হল নাকি!

দ্রোণাচার্য হাত তুলে বললেন, বৎস, অধীর হও না—একটু ধৈর্য ধর। এই কাজটা করতে তোমাকে কতগুলো নিয়ম মানতে হবে। প্রথমে যে-কোনও দুটো পকেট তুমি পরীক্ষা করতে পারবে। পরীক্ষা শেষ হলেই আমি সুইচ টিপে টেবিলটা কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে দেব, যাতে তুমি খেয়াল রাখতে না পার যে, কোন দুটো পকেট তুমি দেখেছ। টেবিলটা থামার পর তুমি আবার যে কোনও দুটো পকেট পরীক্ষা করতে পারবে। তারপর আবার আমি টেবিল ঘুরিয়ে দেব। এরকম করে খেলাটা চলতে থাকবে। তোমাকে আমি চারটে টেনিস

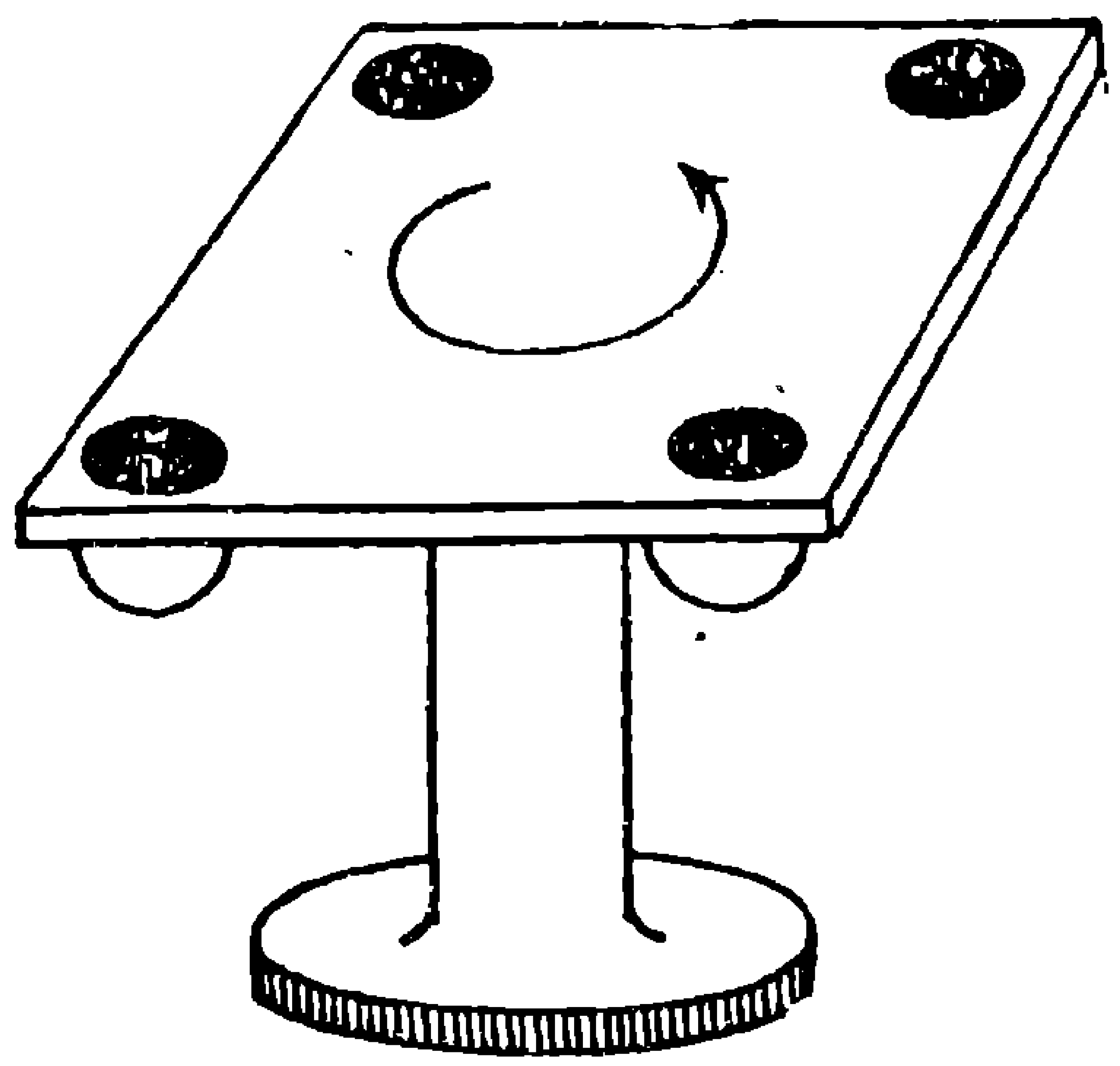

দ্রোণাচার্যের 'মেড ইন জাপান' টেবিল

বল দিচ্ছি। প্রত্যেকবার পরীক্ষার সময় তুমি চাইলে পকেটে বল রাখতে পার, বা বল পকেট থেকে বার করে নিতে পার, অথবা পকেট যেমন আছে সেই অবস্থাতেই রেখে দিতে পার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অন্তত কতবার পকেট পরীক্ষা করার সুযোগ পেলে তুমি নিশ্চিতভাবে কাজটা শেষ করতে পারবে ?

ভীম একটু চিন্তা করে বললেন, গুরুদেব, আপনি এসব প্যাঁচ কষে আমাকে ঠকাতে পারবেন না। আমি প্রবাবিলিটি থিওরি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। আমি জানি যে, এধরনের খেলায় কখনোই কোনও নিশ্চয়তা থাকতে পারে না। যেহেতু টেবিলের চারটে পকেটই একরকম দেখতে, আমার পক্ষে কখনোই বোঝা সম্ভব নয় যে, ঠিক কোন পকেটগুলো আমার দেখা হয়ে গেছে। সুতরাং এমনও হতে পারে যে, বহু দান পরেও একটা না একটা পকেট হয়তো বাদ পড়ে যাবে। অতএব, আমি কখনোই নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না যে, কতবারের মধ্যে কাজটা শেষ করা যাবে।

দ্রোণাচার্য মুচকি হেসে বললেন, বৎস, তুমি ফিরে যাও এবং কিছুদিন মন দিয়ে যুক্তিশাস্ত্র পড়। যুক্তিশাস্ত্রটা কী জানতো ? তোমরা যেটাকে আজকাল লজিক বল !

যারা ধাঁধা ভালবাসে তারা সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাক। তাদের জন্য উত্তরটা পরিশিষ্টে যোগ করে দিলাম। আমরা আবার সেই সম্ভাবনার প্রশ্নেই ফিরে আসি। যে কথা বলছিলাম, সম্ভাবনার সূক্ষ্ম বিচার খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। আমরা গণিতজ্ঞ নই। মনে হয় ওই ভারটা গণিতজ্ঞদের ওপরই ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তাঁরাই ওগুলোর সমাধান করে ফেলুন। আমরা তাই ভেঙেই জীবনটা দিব্বি চালিয়ে নিতে পারব। তবে মাঝে মধ্যে মাথা ঘামাতে হবে বই কি। শুধু সম্ভাবনা জানা থাকলেই যে, শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে, তা কি বলা যায় ? যেমন, সেই তিন ডাকাতের গল্পটা।

মধ্যপ্রদেশের তিন ডাকাত—বীর সিং, জয় সিং আর রাম সিং। লুটের হিস্যে নিয়ে তাদের মধ্যে ঘোরতর ঝগড়া লেগেছে। এদের মধ্যে বীর সিং আর জয় সিং হচ্ছে লড়াইয়ে দুর্দান্ত পটু। দুজনেরই প্রায় অব্যর্থ টিপ। গুলি ছুঁড়লে শতকরা নব্বইবারই লক্ষ্যভেদ করে! রাম সিং অতটা ভাল নয়, তবে গড়ে সত্তরবার সেও পারে। কিন্তু বুদ্ধিতে রাম সিং অন্য দুজনের চেয়ে নিঃসন্দেহে দড়।

অনেকক্ষণ চ্যাঁচামেচি করে সবাই যখন ক্লান্ত, তখন রাম সিং প্রস্তাব করল যে, গুলিতেই এর ফয়সালা হোক। কী রকম ? রাম সিং বলল, আমরা

তিনজন বন্দুক নিয়ে তিন কোণে গিয়ে দাঁড়াব। পালাকরে প্রত্যেকে প্রত্যেকের দান এলে একটা করে গুলি ছুঁড়ব। মানে প্রথমে যদি বীর সিং ছোঁড়ে, তারপরে ছুঁড়বে জয় সিং, তারপর আমি, তারপর আবার বীর সিং—এইভাবে। শেষ পর্যন্ত যে বেঁচে থাকবে সেই পাবে সমস্ত লুট।

বীর সিং আর জয় সিং ভেবে দেখল, প্রস্তাবটা মন্দ নয়। রাম সিং ওদের কাছে কোনও একটা সমস্যাই নয়। সমস্যা হল ওদের নিজেদের নিয়েই।

গুলি প্রথম ছুঁড়বে কে ? বীর সিং প্রশ্ন করল।

তোমাদের দুজনের একজন। আমার পকেটে একটা পয়সা আছে, তোমরা চাওতো সেটা টস করি।

এখানে মনে হতে পারে যে, রাম সিং অতিশয় মূর্খ। কে কত ভাল লক্ষ্যভেদ করতে পারে, সেই সম্ভাবনাটা বিচার করলে কোনও সন্দেহই থাকে না যে, বীর সিং বা জয় সিং—দুজনেই অতি সহজে রাম সিংকে পরাজিত করবে। সেক্ষেত্রে এই ধরনের প্রস্তাব তোলা কেন বাপু ? সেখানেই মজা। জোর করে অবশ্য কিছু বলা যায় না। তবে বীর সিং ও জয় সিং এই প্রস্তাবে রাজি হলে, অসম্ভব মনে হলেও শেষ পর্যন্ত রাম সিং-ই টিকে থাকবে ! কারণ হল, বীর সিং বা জয় সিং—যেই প্রথম গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পাক না কেন, তার কাজ হবে অন্যজনকে মেরে ফেলা। রাম সিংকে প্রথমে কেউই গুলি করতে চাইবে না, কারণ সে ওদের মত বড় যোদ্ধা নয় ! এখন যেহেতু বীর সিং আর জয় সিং দুজনেরই লক্ষ্য অব্যর্থ, এবং আগে বা পরে হোক, একে অন্যজনকে মারার সুযোগ প্রথমেই তারা পাচ্ছে ; অতএব প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, তাদের মধ্যেই প্রথমে একজন মারা যাবে।(যদি কোনও অভাবনীয় কারণে তারা একে অন্যকে মিস করে এবং রাম সিং-এর দান আসে, সেক্ষেত্রে রাম সিং-এর কৌশল হবে ইচ্ছাকৃতভাবে ওদের একজনকে মিস করা—যাতে ওরা নিজেদের মারবার সুযোগ আবার পায় !) যাই হোক, বীর সিং বা জয় সিং-এর মধ্যে কেউ একজন মারা গেলে, পরের দানটাই রাম সিং-এর। রাম সিং-এর টিপও যে খুব খারাপ—তা নয়। শতকরা সত্তরবারই সে লক্ষ্যভেদ করে। তাই বলছিলাম যে, রাম সিং-এর টিকে থাকার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি !

যারা অঙ্ক ভালবাসে না, তারা নিশ্চয় এতক্ষণে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে ! পৃথিবীর সবকিছুকেই যদি প্রবাবিলিটির ফাঁদে ধরতে হয়, আর অগুনতি হিসেব নিকেষ করে জীবনটা কাটাতে হয়, তাহলে আনন্দটা আর রইল কোথায় ?

তাছাড়া সেটা করতে পারা কি সম্ভব ? কে প্রবাবিলিটি কষতে পারে যে, কখন ধর্মঘট হবে, কবে বাজারে গ্যাস পাওয়া যাবে না, কোনদিন মাছের দাম বাড়বে, ইত্যাদি ইত্যাদি ? অজানার সঙ্গেই তো আমাদের কারবার। অজানা অজানাই থাকবে, তবু তাকে প্যাঁচে ফেলে কব্জা করার মধ্যেই তো জীবনের সার্থকতা ! এতে মনে পড়ে গেল আমাদের প্রশান্ত শিকদারের কথা। শিকদার মশাই খুব একটা নিশ্চিত নন যে, ভগবান আছেন, না নেই। তবু প্রতিবছর চল্লিশ মাইল হাইওয়ে ঠেঙিয়ে নিউ ব্রান্‌সউইকের পুজোমণ্ডপে গিয়ে অঞ্জলি দিয়ে আসেন। প্রশ্ন তুললে বলেন, বাপু হে, ভগবান হয় আছেন, অথবা নেই। যদি ভগবান থেকে থাকেন, অথচ আমি অঞ্জলী না দিই, তাহলে অবশ্যই তিনি চটবেন। আর তাঁকে চটানো মানে ইহকাল পরকাল—দুইই ঝরঝরে হওয়া। অন্যপক্ষে, তিনি যদি না থাকেন, তাহলেও ক্ষতি নামমাত্র। মাঝে মধ্যে পাঁচমিনিট দাঁড়িয়ে নমোনমো করে কিছু ফুলপাতা ছোঁড়া—এইটুকুই।

শুনেছি চার্চ সম্পর্কে প্রবাবিলিটি থিওরির অন্যতম প্রবর্তক ব্লেজ প্যাস্কালও (Blaise Pascal) একই ধরনের যুক্তি ব্যবহার করেছিলেন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার নিজেরও অনেক সংশয় আছে, তাই অঞ্জলীটঞ্জলী আমি কখনও দিই না। মাঝে মাঝে এ নিয়ে যখন দুশ্চিন্তা হয়, তখন নিজেকে বোঝাই : ভগবান যদি সত্যিই থেকে থাকেন, তিনি হবেন সর্বজ্ঞ। আমার অজ্ঞতাটা তবু হয়তো তিনি ক্ষমা করবেন। কিন্তু শিকদারমশাই বা প্যাস্কালের মত লোকরা ভাঁওতা দিয়ে তাঁর হাত থেকে রেহাই পাবেন না !

পরিশিষ্ট

দ্রোণাচার্য ঠিকই বলেছিলেন যে, ভীমের কিছুদিন লজিক পড়া উচিত। ভীম একটু যুক্তি ব্যবহার করলেই বুঝতে পারতেন যে, মাত্র পাঁচবার পকেট পরীক্ষা করলেই কাজটা শেষ করা যায়।

(১) প্রথমে কোনাকুনি দুটো পকেটে হাত ঢুকিয়ে তাদের এক অবস্থাতে আনতে হবে। ধরা যাক, তাদের বলশূন্য অবস্থায় আনা হল। আরও ধরা যাক যে, ঘন্টা বাজল না। অর্থাৎ হয় অন্য দুটো পকেটেই বল আছে, অথবা একটাতে আছে।

(২) টেবিল ঘোরান শেষ হলে, দুটো পাশাপাশি পকেট এবার পরীক্ষা করতে হবে। যদি পকেটদুটো বলশূন্য অবস্থায় থাকে, তাহলে

সেইভাবে রেখে দিতে হবে। না থাকলে, যে পকেটে বল আছে, সেটা বার করে ফেলতে হবে। ধরা যাক, ঘন্টা এখনও বাজল না। সেক্ষেত্রে টেবিলের একটা পকেটে এখনও একটা বল আছে।

(৩) আবার টেবিল ঘোরান হল। এবার আবার দুটো কোনাকুনি পকেট পরীক্ষা করতে হবে। যদি একটা বল কোনও পকেটে পাওয়া যায়, সেটা বার করলেই ঘন্টা বাজবে। যদি দুটো পকেটই শূন্য থাকে, সেক্ষেত্রে একটা বল একটা পকেটে ঢোকাতে হবে। এখন টেবিলের পকেটগুলোর অবস্থা হবে ছবির মত।

(৪) আবার টেবিল ঘোরান হল। এবার পাশাপাশি পকেট পরীক্ষা করতে হবে। যদি দুটোই এক অবস্থায় থাকে (অর্থাৎ বলযুক্ত বা বলশূন্য অবস্থায়), তাহলে তাদের অবস্থা উলটে দিলেই ঘন্টা বাজবে। যদি দুটোর অবস্থা ভিন্ন থাকে। তাহলে যেখানে বল আছে, সেখান থেকে বলটা বার করে অন্য পকেটে রেখে দিতে হবে। এখন টেবিলের পকেটগুলোর অবস্থা হবে নিচের ছবির মত।

(৫) আবার টেবিল ঘোরান হল। এবার কোনাকুনি দুটো পকেটের অবস্থা পালটে দিলেই ঘন্টা বাজবে।

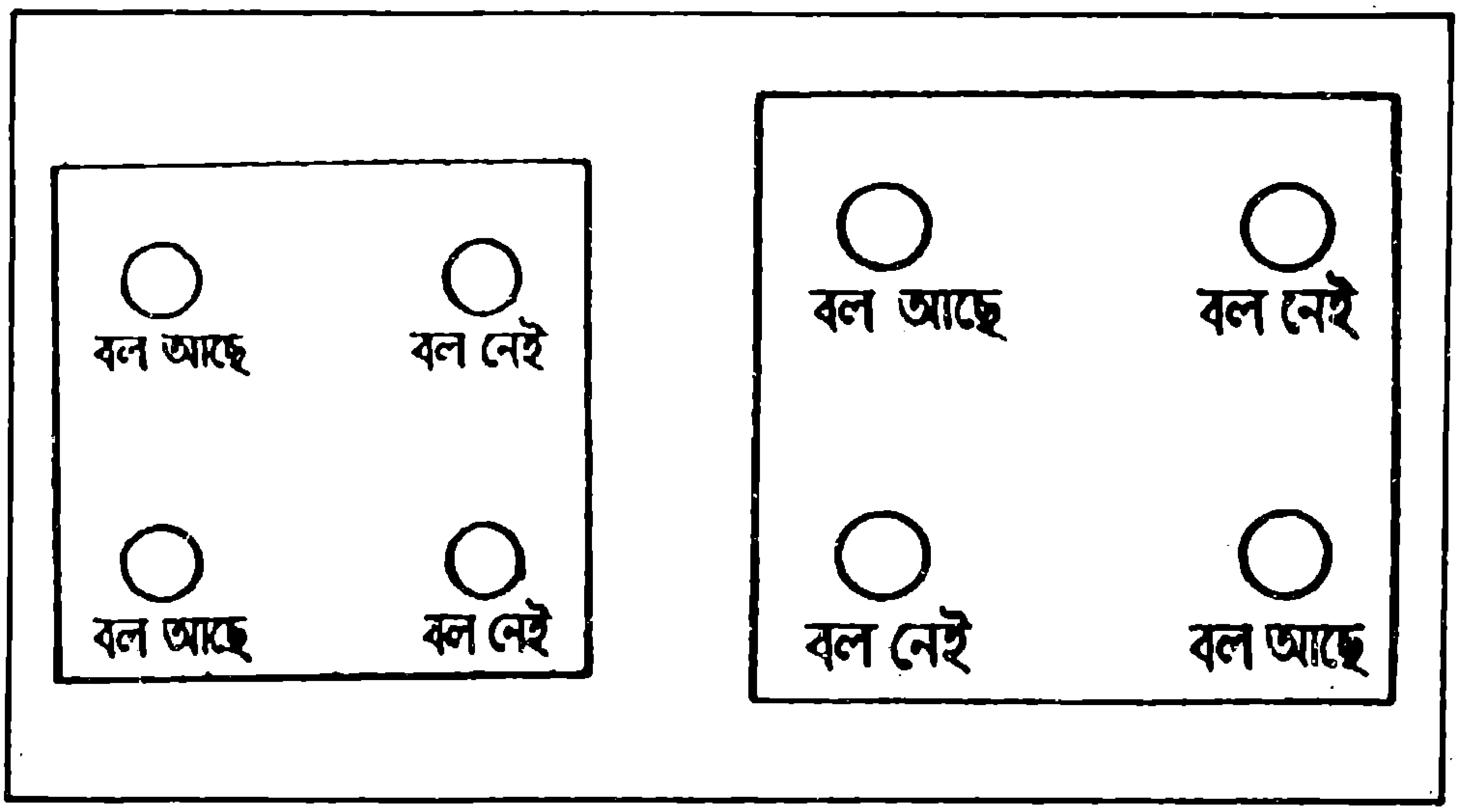

দৈনন্দিন জীবনের 'প্যারাডক্স' !

প্যারাডক্স কথাটার অর্থ মোটামুটিভাবে আমরা সবাই জানি। যখন আপাতদৃষ্টিতে অখণ্ডনীয় যুক্তি দিয়ে এমন একটা সিদ্ধান্তে আসা হয় যেটা অস্বীকার করা কঠিন, অথচ সঠিক বলেও বিশ্বাস হয় না—তখনই প্যারাডক্সের সৃষ্টি হয়। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে অবশ্য অনেক সময়েই ধরা পড়ে যে, যুক্তিপ্রয়োগের কোথাও একটা গলদ ছিল, অথবা যে-সব বিশ্বাস বা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে যুক্তি স্থাপন করা হয়েছে—সেগুলোর মধ্যেই অনেক গোলমাল আছে। এই ধরনের বিচার বিশ্লেষণে শুধু যে, বহু প্যারাডক্সের প্যারাডক্সত্ব ঘোচে—তা নয়, বিজ্ঞান ও দর্শনের অনেক অজ্ঞাত দরজাও আমাদের সামনে খুলে যায়। তাই নিছক ধাঁধার আনন্দ ছাড়াও, বিজ্ঞান বা দর্শনের জগতে প্যারাডক্সের মূল্য অপরিসীম !

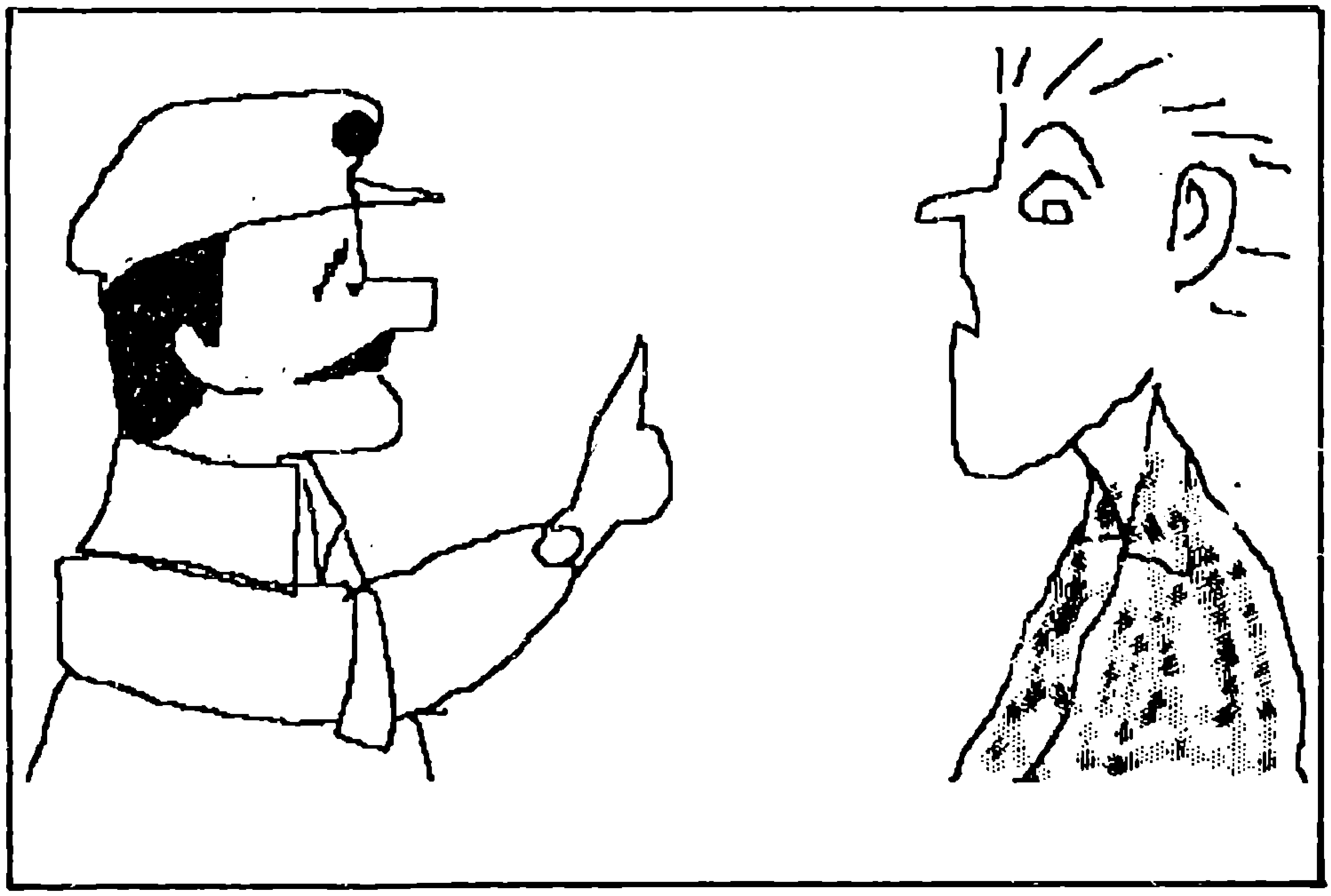

প্যারাডক্সের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে যে, এটা আমাদের যুক্তিবুদ্ধিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে আমাদের মনের ভেতরে কৌতুহল জাগিয়ে তোলে। সাধারণ ভাবনা চিন্তায় যেটা হওয়া উচিত ছিল—তা মোটেই হচ্ছে না, সুতরাং বিস্মিত হওয়া ছাড়া আর উপায় কী ? কী করে এটা হতে পারে ! ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কুলকিনারা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের জানতেই হয় যে, 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি !'

কিন্তু এসব হল আমাদের মত সাধারণ দশ পাঁচটা লোকের প্রতিক্রিয়া। জ্ঞানীগুণীদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁদের বিস্ময়টা এত অল্পে হাল ছেড়ে দিয়ে শেষ হয় না। এ নিয়ে নির্জনে তাঁরা অনেক ভাবনা চিন্তা করেন। তার পরিণতি সবসময় যে খুব সুখের হয়, তাও নয়। গল্পে আছে যে, 'ফিলেটাস অফ কস' নাকি 'লায়ার প্যারাডক্স'* নিয়ে দুর্ভাবনা করতে করতে অকালে মারা যান ! কী আফশোসের কথা ! ফিলেটাস যদি আরও হাজার কয়েক বছর বেঁচে থাকতেন, তাহলে অন্তত নিশ্চিন্তমনে তিনি মরতে পারতেন। কারণ, জার্মান গণিতজ্ঞ কার্ট গোয়েড়লের দৌলতে তিনি জেনে যেতেন যে, এই প্যারাডক্সের আসল গোলমালটা ঠিক কোথায় !

১৯১৮ সালে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক বাট্রান্ড রাসেল তাঁর 'নাপিত প্যারাডক্স'-টি সৃষ্টি করেন : কোনও একটা গ্রামে কেবল একজন মাত্র নাপিত থাকত। সে, যারা নিজেরা নিজেদের দাড়ি কামায় তাদের বাদ দিয়ে, গ্রামের প্রত্যেকটি লোকের দাড়ি কামিয়ে দিত। আমরা জানি যে, নাপিতটির নিজের দাড়িও কামান থাকত।

প্রশ্ন হল, তার দাড়ি কে কামাত ?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, নাপিত নিজেই নিজের দাড়ি কামাত। কিন্তু সেক্ষেত্রে নাপিত এমন একজনের দাড়ি কামাচ্ছে যে, নিজে নিজের দাড়ি কামায় ! প্রশ্নানুসারে সেটা সম্ভব নয়। অন্যপক্ষে, সে যদি নিজের দাড়ি নিজে না কমাত, সেক্ষেত্রে সে—যারা নিজেরা নিজেদের দাড়ি কামায় তাদের বাদ

---

* লায়ার প্যারাডক্সের একটি বহুল প্রচলিত রূপ হল এই বাক্যটি : 'আমি যা বলছি সেটা মিথ্যা।' এই অতি সাধারণ বাক্যটির অর্থ খুঁজে বার করতে গিয়ে বহু গ্রীক দার্শনিক নাজেহাল হয়েছিলেন। যদি মনে করা হয় যে, বাক্যটি সত্য, তাহলে বাক্যটির তথ্য অনুসারে সেটি মিথ্যা ! অন্যপক্ষে যদি ধরা হয় যে, বাক্যটি মিথ্যা, তাহলে বাক্যটি তো ভুল কথা বলেনি, অর্থাৎ সেটি সত্য ! এই বাক্যটির যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেটি হল আত্মোল্লেখ বা Self-reference। এই বাক্যটি তার নিজের সম্পর্কেই কিছু বলছে। যখনই কোনও বাক্যে আপন সত্যতা বিষয়ক কোনও উদ্ধৃতি থাকে, তখনই তার অর্থ নিরূপণে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

দিয়ে গ্রামের প্রত্যেকটি লোকের দাড়ি কামানোর নিয়মটি ভঙ্গ করছে। সত্যিই তো, তাহলে কে নাপিতের দাড়ি কামাত ?

এর একমাত্র উত্তর হল, এমন নাপিত থাকতে পারে না—আমেরিকার দার্শনিক উইলার্ড কুইন এ ধরনের একটা মন্তব্য করেছিলেন। যদিও ব্যাপারটা অতখানি সহজ সরল নয়। রাসেলের এই প্যারাডক্সটার সঙ্গে ১৯০১ সালে সেট থিওরির ওপর রচিত তাঁর আগের একটা প্যারাডক্সের খুব একটা তফাৎ নেই। জার্মান গণিতজ্ঞ গর্টলব ফ্রেজের সারাজীবনের গবেষণাকে সেই প্যারাডক্সটা এক নিমেষে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল ! ফ্রেজে ছিলেন মর্ডান ম্যাথাম্যাটিক্যাল লজিকের একজন স্থাপক। রাসেলের প্যারাডক্সটা পড়ামাত্র তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে গাঁথনির ওপরে তিনি ম্যাথেম্যাটিক্যাল লজিককে গড়ে তুলেছেন, সেই গাঁথনির ঠিক নিচেই মস্ত একটা ফাটল আছে ! ফ্রেজে সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল স্বীকার করে অন্যান্য গবেষকদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের প্রতি এই একনিষ্ঠ আনুগত্য ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধ রাসেলকে এত মুগ্ধ করেছিল যে, এর ষাট বছর বাদেও তিনি লিখেছিলেন যে, আমার জ্ঞানত আর কিছুই এ পৃথিবীতে নেই যার সঙ্গে ফ্রেজের সত্যানুসন্ধিৎসার তুলনা করা যায় !

কী থেকে কিসে চলে এলাম ! আসলে যেটা বলতে যাচ্ছি—সেটা হল, প্যারাডক্স যে সব বৈপ্লবিক পরিবর্তন বিজ্ঞান, গণিত বা যুক্তিজগতে এনেছে—তা পরিষ্কারভাবে বোঝার ক্ষমতা অবশ্যই আমাদের মত সাধারণ লোকের নেই ! জেনোর আকিলেস ও কচ্ছপের প্যারাডক্স থেকে অসীম শ্রেণীর যোগফলের সসীমতা আবিষ্কারের ব্যাপারটা যদিও বা আমরা কিছুটা আঁচ করতে পারি, কিন্তু আত্মোল্লেখ সমস্যার সূত্রধরে গোয়েড্‌লের উপপাদ্য, বা মাইকেলসন-মোরলির আলোর গতি পরীক্ষার আপাত বিরোধী ফল থেকে রিলেটিভিটির সূচনাটা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা আমাদের অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। আমার মতে সে চেষ্টা করতে গিয়ে খামাকা মাথা ধরানোর কোনও অর্থ হয় না। বরং সাদামাটা দুয়েকটা প্যারাডক্স নিয়ে আলোচনা করা যাক—যেগুলো হরদম চোখে পড়ে, কিন্তু আমরা খেয়াল করি না !

ধরা যাক, একটা পুকুরে একটা ব্যাঙাচি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেটা দেখে যে কেউ বলতে পারে যে, ওটা একটা ব্যাঙাচি। এবার মাস দুয়েক বাদে আবার সেই পুকুরে যাওয়া যাক। এবার দেখা যাবে যে, ব্যাঙাচি আর ব্যাঙাচি নেই, একটা ব্যাঙ হয়ে সেটা লাফাচ্ছে। এ আবার নতুন কথা কি, এখানে প্যারাডক্স

কোত্থেকে আসছে ? আসছে, কিন্তু কীভাবে আসছে সেটা নিয়ে এক আলোচনা করা যাক। ধরা যাক, একটা স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা এই দুমাস ধরে সেকেন্ডে চব্বিশটা করে ছবি তুলেছে ওই ব্যাঙাচি কিংবা ব্যাঙটাকে ফোকাস করে। আমার বিশ্বাস যে, কারোর মনে কোনও সন্দেহ নেই যে—এই ছবির রিলের প্রথম ছবিটা হবে ব্যাঙাচির আর শেষের ছবিটা হবে ব্যাঙের। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই ছবির রিলগুলোর মাঝামাঝি কোথাও কি এমন দুটো পাশাপাশি ছবি আছে যেটা দেখে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আগের ছবিটা ব্যাঙাচির আর পরের ছবিটা ব্যাঙের ? এর উত্তর দিতে গিয়ে প্রায় সবাই আমতা আমতা করবেন। তার মানে ব্যাঙ আর ব্যাঙাচির তফাৎ সবাই জানেন, কিন্তু ব্যাঙাচি থেকে কখন ব্যাঙ হচ্ছে সেটা কেউ জানেন না ! এটা কি একটা প্যারাডক্স নয় ?

ওপরের প্যারাডক্সটার সৃষ্টিকার হলেন আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়ার দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক জেমস কার্গিল (James Cargile)। কিন্তু প্যারাডক্সটা নতুন নয়। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেও গ্রীক দার্শনিকরা এধরনের প্যারাডক্স নিয়ে নানান দুশ্চিন্তা করেছেন ! ব্যাঙ-ব্যাঙাচি জাতীয় প্যারাডক্স আমাদের দেশেও নতুন নয়। 'বিন্দু বিন্দু করে সিন্ধু', বা 'এক পয়সায় কেউ বড়লোক হয় না' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সিন্ধু থেকে ঠিক কতগুলো জলবিন্দু সরিয়ে নিলে সেটা আর সিন্ধু থাকে না—সে নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা নিশ্চয় অনেক ভাবনা চিন্তা করেছেন। এক পয়সায় কেউ বড়লোক হয় না ঠিকই, কিন্তু একপয়সা একপয়সা করে যদি কারোর পুঁজি বাড়তে থাকে একসময় না একসময় তো সে বড়লোক হয়ে যেতে পারে ! কিন্তু ঠিক কখন সেই পরিবর্তনটা ঘটে ?

অনেক দার্শনিকের মতে এই প্যারাডক্সগুলোর কারণ হচ্ছে সংজ্ঞাজনিত। ব্যাঙ, ব্যাঙাচি, সিন্ধু, বিন্দু, বড়লোক, গরীব ইত্যাদির সংজ্ঞা খুব নিখুঁতভাবে দেওয়া যায় না। সমস্যার সৃষ্টি ঠিক সেইজন্যই হয়। ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙের রূপান্তর এক ঝটকায় হয় না, সেটা ঘটে ক্রমশ। ব্যাঙ ও ব্যাঙাচির ভেতরে অনেক স্তর রয়েছে যার সঠিক রূপ বিশ্লেষণ প্রায় অসম্ভব ! এই প্যারাডক্সের হাত থেকে মুক্তি পেতে অনেক সময় আমরা ইচ্ছে মত একটা সহজ সংজ্ঞা খাড়া করি। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে যখন আমরা বলি আঠেরো বছর বয়স হলেই একজন সাবালক ! তার অর্থ কী? সতেরো বছর এগারো মাস উনত্রিশ দিন থেকে একদিন পরে কী বুদ্ধির পক্কতা হঠাৎ বেড়ে যায় ? এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আট-দশ বছরের ছেলেমেয়েদের থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছরের

ছেলেমেয়েরা নিশ্চয় বেশি অভিজ্ঞ ও আত্মনির্ভর। কিন্তু সতেরো, আঠেরো, উনিশের মধ্যে তফাৎটা কি সহজে ধরা সম্ভব ? তবু অনেক দেশে আঠেরো বছর বয়সটাকে 'সাবালক বয়স' হিসেবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কোন দেশে সেটা একুশ বছর। এদের যৌক্তিকতা সম্পর্কে হাজার প্রশ্ন থাকলেও, প্যারাডক্সের হাত থেকে অন্তত মুক্তি পাওয়া গেছে !

দৈনন্দিন জীবনের আরেকটা প্যারাডক্সের কথা লিখে এবারের প্রসঙ্গটা শেষ করছি। ১৯৫১ সালে আমেরিকার র‍্যান্ড কার্পোরেশনের দুই গবেষক মেলভিন ড্রেশার (Melvin Dresher) ও মেরিল ফ্লাড (Merill M. Flood) 'কয়েদীর সমস্যা' (The Prisoner's Dilemma) বলে একটা প্যারাডক্স উপস্থাপন করেন। সমস্যাটা হল এই : এক দারোগা দুজন সন্দেহজনক লোককে গ্রেপ্তার করেছেন। দুজনের পকেটেই রিভলভার পাওয়া গেছে। দারোগার ধারণা, কয়েকদিন আগে লিলুয়া ব্যাঙ্কে যে ডাকাতিটা হয়েছে, তার সঙ্গে এরা দুজনেই যুক্ত। কিন্তু দারোগা এও জানেন যে, সেটা প্রমাণ করা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। অনেক ভেবেচিন্তে উনি দুজনকে আলাদা আলাদা করে ঘরে ডেকে এই কথাগুলো বললেন : দেখ বাপু, তোমাদের দুজনের কেউই যদি দোষ স্বীকার না কর, তাহলে ডাকাতির জন্য সাজা তোমাদের হবে না ঠিকই, কিন্তু বেআইনীভাবে অস্ত্র রাখার অপরাধে এক বছরের জেল কেউ ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু তুমি যদি দোষ স্বীকার করে রাজসাক্ষী হও, আর অন্যজন দোষ অস্বীকার করে ; তাহলে তুমি বেকসুর খালাস পাবে, আর অন্যজনের দশবছরের জেল জুটবে। তবে তোমরা দুজনেই যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে কেউই ছাড়া পাবে না। ডাকাতির জন্য পাঁচ বছরের জেল তোমাদের খাটতে হবে। তোমাকে এক ঘন্টা সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে ঠিক করে ফেল যে, কী করতে চাও। কিন্তু খবরদার, এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোনও আলোচনার চেষ্টা করো না। করলে আর জেলভোগের দুশ্চিন্তা করতে হবে না, প্রাণটাই খোয়াবে !

প্রশ্ন হচ্ছে, লোকদুটো কী করবে ?

এর উত্তর দেবার আগে প্রথমে ধরেই নেওয়া যাক যে, দুজনেই আসলে দোষী, এবং ওদের চেষ্টা হচ্ছে, যাতে অতি অল্পসাজার ওপর দিয়ে এযাত্রা রেহাই পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে উত্তরটা খুবই সোজা—ওদের দুজনেরই উচিত হবে দোষটা অস্বীকার করা। সেক্ষেত্রে দুজনেরই মাত্র এক বছর জেল হবে। কিন্তু সেটাই কি ওরা করবে ? ওদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জিনিসটা একটু

ভাবা যাক। প্রথম জন ভাববে, ধরা যাক, আমি দোষ স্বীকার করলাম, কিন্তু ও করলো না। সেক্ষেত্রে, আমি বেকসুর খালাস পাচ্ছি। নিঃসন্দেহে তার চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। আর ও যদি দোষ স্বীকারও করে সেক্ষেত্রেও আমার পক্ষে দোষ স্বীকার করাটা হবে বুদ্ধিমানের কাজ ; কারণ দশের বদলে মাত্র পাঁচ বছরের জন্য জেল খাটতে হবে।

বলা বাহুল্য দ্বিতীয়জনও ঠিক একই ভাবে চিন্তা করবে, এবং এক ঘন্টা বাদে দুজনে দারোগার কাছে এসে দোষ কবুল করবে। এইরকম বুদ্ধি খাটানোর ফলে ওদের লাভটা হল যে, এক বছরের বদলে ওরা পাঁচ বছরের জন্য জেলে গেল!

ডগলাস হফ্‌স্টেটার (Douglas R. Hofstadter) এই প্যারাডক্সটাকেই একটু অন্যভাবে 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকায় পরিবেশন করেছিলেন। ধরা যাক, একজন লোকের কাছে অনেক টাকা আছে, আর সে খোঁজ করছে আকবরী মোহরের। অনেক খুঁজে পেতে সে একজন মাত্র লোককে পেল যার কাছে অনেকগুলো আকবরী মোহর আছে, এবং সে সেগুলো বিক্রি করতে চায়। তারা দুজনে দরদাম করে যখন সন্তুষ্ট হল, তখন যে কোনও কারণেই হোক—ঠিক হল যে, লেনদেনটা হবে সম্পূর্ণ গোপনে। দুজনেই তাদের ব্যাগ বনের মধ্যে দুটো নির্দিষ্ট জায়গায় রাখবে। তারপর একজন অন্যজনের ব্যাগ তুলে নিয়ে ফিরে যাবে! ধরা যাক, দুজনেই জানে যে, ভবিষ্যৎ-এ তাদের মধ্যে আর দেখা হবে না বা লেনদেন হবে না।

বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় দুজনেরই দুশ্চিন্তা থাকবে যে, অন্যজন যে ব্যাগটা রাখছে সেটা হয়তো ফাঁকা। এ বিষয় সন্দেহ নেই যে, দুজনেই যদি ভর্তি ব্যাগ রাখতো, তাহলে দুজনেরই লাভ হত ; কারণ একজনের দরকার ছিল টাকার—আরেকজনের আকবরী মোহরের। কিন্তু এও ঠিক যে, লাভের পরিমাণটা আরও অনেকগুণ বেশি হত যদি কিছু না দিয়েই ভর্তি ব্যাগটা পাওয়া যেত! এ অবস্থায় ফাঁকা ব্যাগ রেখে আসার লোভটা সম্বরণ করা সত্যিই শক্ত! বস্তুত দুজনেই নিজেকে বোঝাতো এইভাবে : অন্যপক্ষ যদি ভর্তি ব্যাগ আনে, সেক্ষেত্রে আমার পক্ষে ফাঁকা ব্যাগ রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ আমি যা খোঁজ করছিলাম সেটা পাচ্ছি—আর তারজন্য আমার কানাকড়িও খরচা হচ্ছে না! এমন কি অন্যপক্ষ যদি ফাঁকা ব্যাগ রেখে যায়, সেক্ষেত্রেও আমি ঠকছি না—কারণ আমিও ফাঁকা ব্যাগ রাখছি! অতএব, অন্যপক্ষ যাই করুক না কেন, আমার পক্ষে ফাঁকা ব্যাগ রাখাটাই যুক্তিযুক্ত। দুঃখের বিষয় এই যুক্তিযুক্ত কাজ করার ফল হল, দুজনেরই শূন্য হাতে বাড়ি ফেরা। কী মুশকিল, যুক্তির

সমীকরণে কি সহযোগিতার কোনও স্থান নেই ?

এই প্যারাডক্সটার সঙ্গে বাস্তব জগতের বহু সমস্যার মিল হয়তো অনেকেরই চোখে পড়ছে। আমি তো ভাবছি ভারত ও পাকিস্তানের কথা। দুদেশই প্রতিরক্ষার খাতে অজস্র টাকা ব্যয় করে। দুদেশেই দুটো পথ খোলা আছে : হয় ক্রমাগত এই খাতে টাকা ঢেলে যাওয়া, অথবা বন্ধ করা। যদি দুদেশই প্রতিরক্ষার খাতে টাকা খরচা করা বন্ধ করে—তাহলে সেই টাকায় সমাজ কল্যাণমূলক অনেক কাজ করা সম্ভব হবে। কিন্তু এক দেশ যদি তাদের মিলিটারি শক্তি বাড়াতে থাকে, আর অন্যদেশ সেটা না করে ; তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই এক দেশের মিলিটারি এত শক্তিশালী হয়ে যাবে যে, অন্যদেশকে জয় করে নেবার কথা ভাববে। কিন্তু দুদলই যদি মিলিটারিতে টাকা ঢালে, তাহলে দুদলই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ মিলিটারি ব্যবহার করে কেউই কাউকে পরাজিত করতে পারবে না, অন্যপক্ষে সমাজ হিতকর কাজেও পয়সা খরচা করার ক্ষমতা তাদের খুব একটা থাকবে না। দুঃখের বিষয়, এতদিন পাশাপাশি থেকেও সহযোগিতার মূল্য আজও আমরা বুঝলাম না !

রেমন্ড স্মালিয়ানের মজাদার ধাঁধা

রেমন্ড স্মালিয়ানের ধাঁধার বই 'হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস বুক ?' যখন প্রকাশিত হয়, তখন সুলেখক মার্টিন গার্ডনার মন্তব্য করেছিলেন, "এত মৌলিক, এত সুগভীর এবং এত মজার রিক্রিয়েশ্যানাল লজিক ও অঙ্কের বই আগে কখনো লেখা হয়নি।" অঙ্ক ও যুক্তির ধাঁধার জগতে মার্টিন গার্ডনার হলেন কিংবদন্তি পুরুষ। তাঁর কাছ থেকে এতবড় প্রশংসা পাওয়াটা চাট্টিখানি কথা নয়! 'হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস বুক ?'-এর প্রায় পরপরই স্মালিয়ান সাহেব অনেকগুলো ধাঁধার বই লেখেন। সেগুলো পড়ে শুধু মার্টিন গার্ডনার নন, তাবৎ বড় বড় সমালোচক, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী-দামী অধ্যাপক এবং ধাঁধারসিকরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, স্মালিয়ানের বইগুলো শুধু মজারই নয়, গভীর তৎপর্যপূর্ণ এবং চিন্তাশক্তি বাড়ানোর মোক্ষম হাতিয়ার।

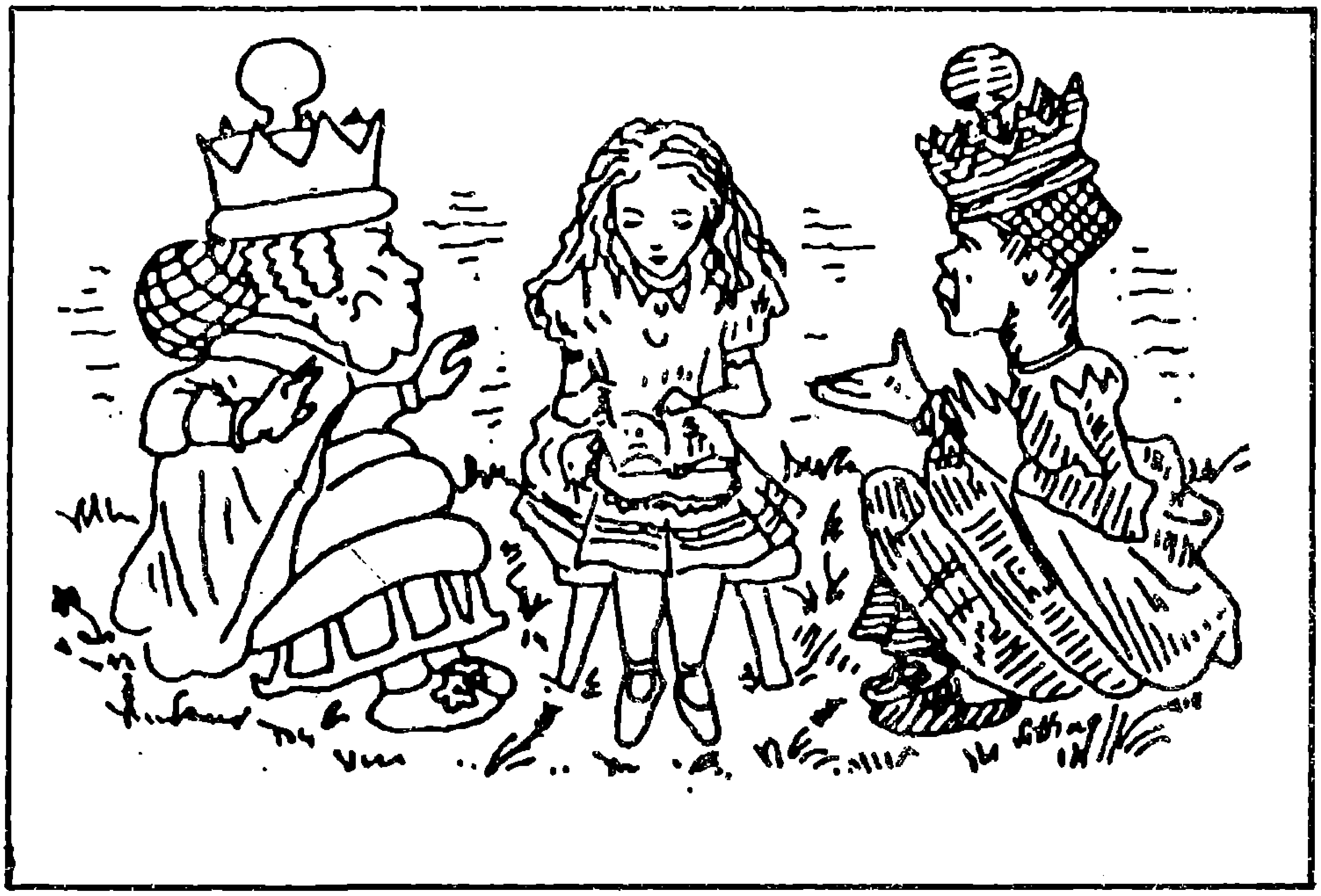

কে এই রেমন্ড স্মালিয়ান, যাঁর বই পড়ে গুণীসমাজ প্রায় মন্ত্রমুগ্ধ ?

রেমন্ড স্মালিয়ানের জন্ম ১৯১৯ সালে। পেশায় তিনি অধ্যাপক। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি থেকে গণিতশাস্ত্রে পিএইচ. ডি ডিগ্রী পাবার পর তিনি কিছুদিন ডার্টমাউথ, প্রিন্সটন ও ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। তারপর তিনি যোগ দেন সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্কের লেহ্‌ম্যান কলেজে। এখনো তিনি সেখানেই আছেন—ম্যাথাম্যাটিক্যাল লজিকের অধ্যাপক হিসেবে। কিন্তু রেমন্ড স্মালিয়ান শুধু অঙ্কের অধ্যাপক নন। তিনি একাধারে সংগীতজ্ঞ (ক্ল্যাসিক্যাল পিয়ানো সংগীতে পারদর্শী), দাবা বিশারদ, ম্যাজিশিয়ান, দার্শনিক, সর্বোপরি ধাঁধাবিদ ও রসজ্ঞ লেখক। তাঁর বইগুলি এই বহুমুখী প্রতিভার সাক্ষ্যই বহন করছে। একদিকে তিনি গবেষণামূলক বই লিখেছেন, যেমন 'থিয়োরি অফ ফর্মাল সিস্টেম্‌স্' ও 'ফার্স্ট অর্ডার লজিক'। 'তাও' দর্শনশাস্ত্রের ওপর তাঁর লেখা বই 'দ্য তাও ইজ সাইলেন্ট' দার্শনিক মহলে স্বীকৃতি পেয়েছে। আবার দাবা খেলার ওপর হাল্কা ধাঁচে লেখা 'দ্য বেস্ মিস্ট্রিস অফ শার্লক হোম্‌স্' এবং 'দ্য বেস্ মিস্ট্রিস অফ দ্য অ্যারাবিয়ান নাইটস্' কেবলমাত্র রসবস্তুর জন্যই যুগোত্তীর্ণ হবে। এ ছাড়া তিনি লিখেছেন একগুচ্ছ অনবদ্য ধাঁধার বই : 'দিস বুক নিড্‌স্ নো টাইটেল', 'দ্য লেডি অর দ্য টাইগার ?' 'অ্যালিস ইন পাজ্‌ল্-ল্যান্ড', 'টু মক্ এ মকিং বার্ড'।

রেমন্ড স্মালিয়ানের বয়স তখন মাত্র ছয়। পয়লা এপ্রিলের সকালে তার ষোল বছরের দাদা এমিল এসে বলল, "রেমন্ড, আজ হল এপ্রিলফুলের দিন। তোকে আজ এমন বোকা বানাবো যে জীবনে ভুলবি না !"

ছোট্ট রেমন্ড জানতো যে দাদার সঙ্গে বুদ্ধিতে সে পেরে উঠবে না, তবু সতর্ক হয়ে রইলো যাতে চট করে বোকা না বনে। দিনটা কিন্তু দিব্যি কেটে গেল, কিছুই ঘটল না। রাতে ঘুমোতে যাবার আগে দাদা এসে বলল, "কি-রে, তুই নিশ্চয় ভেবেছিলি যে আমি কিছু একটা করে তোকে বোকা বানাবো, তাই না ?" রেমন্ড মাথা নাড়ল।

"আমি কিন্তু কিছুই করিনি, করেছি কী ?"

"না।"

"কিন্তু তুই ধরেই নিয়েছিলি যে আমি তোকে বোকা বানিয়ে ছাড়বো, ঠিক কিনা ?"

"তা ঠিক।" স্বীকার করল রেমন্ড।

"তার মানে তোকে আমি ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছি। হোঃ, হোঃ,

হোঃ.... !”

সেই রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রেমন্ড চিন্তা শুরু করল যে, সে সত্যিই বোকা বনেছে কিনা ! দাদার কথা শুনে সে ভেবেছিল, আজ তাকে কোনও একটা প্যাঁচে ফেলে বোকা বানানো হবে। অথচ সত্যিই তেমন কিছু ঘটেনি, সুতরাং সে বোকা বনেনি। কিন্তু অন্যপক্ষে, সে যা ঘটবে ভেবেছিল—তা ঘটেনি। অতএব, সে বোকা বনেছে ! কিন্তু তাই বা হয় কী করে ? যদি দাদা সত্যিই তাকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে থাকে, তাহলে সে যা ঘটবে ভেবেছিল, তাইতো ঘটেছে ! তাহলে আর বোকা বনার প্রশ্ন ওঠে কোত্থেকে !

জীবনের এই প্যারাডক্স ছোট্ট রেমন্ডকে খুব অভিভূত করেছিল বলেই বোধহয় স্মালিয়ানের ধাঁধার বইয়ে প্যারাডক্সের ছড়াছড়ি। প্যারাডক্সের সৃষ্টি হয় যুক্তির অপপ্রয়োগে (মাঝেমাঝে সুপ্রয়োগেও)। কিন্তু এ নিয়ে আগেও নানা আলোচনা করেছি, আজ আর সেটা নিয়ে সময় নষ্ট করবো না।

স্মালিয়ানের অনেক ধাঁধা সত্যবাদী-মিথ্যেবাদীদের নিয়ে। এই জাতীয় ধাঁধা অবশ্য আগেও তৈরি হয়েছে। কিন্তু স্মালিয়ান তাঁর ধাঁধার ভেতরে প্যাঁচের পর প্যাঁচ ঢুকিয়ে যুক্তিজগতের অনেক গভীর সত্যের দিকে পাঠকদের টেনে নিয়ে গেছেন। সত্যবাদী-মিথ্যেবাদীর কিছুকিছু ধাঁধা পাঠকরা হয়তো আগেও শুনেছে। তবু একটা সহজ উদাহরণ প্রথমে দিয়ে নিই।

ধরা যাক, একজন লোক একটা আজব দেশে গেছে—যেখানে শুধু সত্যবাদী আর মিথ্যেবাদীরা থাকে। (সত্যবাদীরা সবসময়ে সত্যিকথা বলে, মিথ্যেবাদীরা মিথ্যে।) সে দেশে গিয়ে তার সঙ্গে দুজন লোকের সঙ্গে দেখা। সে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলো, “ওহে, তুমি সত্যবাদী না মিথ্যেবাদী ?” লোকটি বিড়বিড় করে কি-যে বলল, সে কিছুই বুঝতে পারলে না। তখন পাশের লোকটিকে সে জিজ্ঞেস করলো, “আচ্ছা, বলতো ও আমায় কী বলল ?” পাশের লোকটা উত্তর করল, “ও বলল যে ও হচ্ছে একজন মিথ্যেবাদী।” প্রশ্ন হচ্ছে, দ্বিতীয় লোকটা সত্যবাদী না মিথ্যেবাদী ?

এর উত্তর অবশ্য কঠিন নয় ; কিন্তু চিন্তা করতে হবে এইভাবে :

ধরা যাক, প্রথম লোকটি ছিল সত্যবাদী। তাহলে সে প্রশ্নের উত্তরে বলতো যে, সে সত্যবাদী। এবার ধরা যাক, সে ছিল মিথ্যেবাদী। এক্ষেত্রেও কিন্তু সে নিজেকে বলতো সত্যবাদী। অর্থাৎ প্রথম লোকটি সত্যবাদী কিংবা মিথ্যেবাদী যাই হোক না কেন, নিজেকে সে সবসময়ই বলতো সত্যবাদী। এখন যেহেতু দ্বিতীয়জন বলল যে, প্রথম জন নিজেকে মিথ্যেবাদী বলেছে, তার মানে দ্বিতীয়

জন নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলছে। অতএব সে মিথ্যেবাদী।

স্মালিয়ান অবশ্য তাঁর ধাঁধায় সত্যবাদী-মিথ্যেবাদী নামগুলো ব্যবহার করেননি। সত্যবাদীদের তিনি নাম দিয়েছেন 'নাইট' বা সম্ভ্রান্ত, আর মিথ্যেবাদীদের 'নেইভ' বা প্রতারক। এরা আবার সবাই থাকে অজানা সাগরের মধ্যিখানে একটা দ্বীপে, যেখানে আর কেউ থাকে না। সমস্যার শুরু যখন আমাদের মত কেউ একজন সেখানে গিয়ে হাজির হয়। সে দ্বীপে পৌঁছে দুজনকে দেখে তারা কী ধরনের লোক জিজ্ঞেস করাতে একজন বলল, "আমাদের মধ্যে অন্তত একজন হচ্ছে প্রতারক।"

প্রশ্ন হল, কে কী ধরনের লোক ?

এবার দেখা যাক, কীভাবে ধাঁধাটার সমাধান করা যায়। প্রথমে ধরা যাক, যে-লোকটি উত্তর করেছিল—সে হচ্ছে প্রতারক। সেক্ষেত্রে তার উত্তরটা, 'আমাদের মধ্যে অন্তত একজন হচ্ছে প্রতারক', নিশ্চয়ই মিথ্যে—কারণ প্রতারকরা সবসময়ে মিথ্যে কথা বলে। এখন উত্তরটা মিথ্যে হওয়া মানে, ওদের দুজনের কেউই প্রতারক নয়, দুজনেই সম্ভ্রান্ত। কিন্তু সেটা অসম্ভব, কারণ আমরা প্রথমেই ধরেছি যে উত্তরদাতা হচ্ছে প্রতারক। একই লোক প্রতারক-সম্ভ্রান্ত দুই-ই হতে পারে না। তার মানে আমাদের প্রথম অনুমানটা ভুল—উত্তরদাতা প্রতারক ছিল না, সে ছিল সম্ভ্রান্ত। সেক্ষেত্রে তার উত্তরে কোনও ভুল ছিল না, অর্থাৎ তার সঙ্গীটি ছিল প্রতারক।

সমস্যাগুলোকে আরেকটু জটিল করার জন্য শেষের দিকে স্মালিয়ান সাহেব সম্ভ্রান্ত ও প্রতারক ছাড়া দ্বীপে আরেক দল লোকের আমদানী করেছেন, তারা হল 'সাধারণ'। সাধারণ লোকেরা সত্যি মিথ্যে দুইই বলে, তবে কখন যে কী বলবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। এবার ধরা যাক, ক, খ, ও গ-র মধ্যে একজন হচ্ছে সম্ভ্রান্ত, একজন প্রতারক ও একজন সাধারণ। নিচের উক্তিগুলো তিনজনের কাছ থেকে পাওয়া :

ক। আমি হচ্ছি সাধারণ।

খ। ক-র কথাটা সত্যি।

গ। আমি সাধারণ নই।

প্রশ্ন হল, ক, খ, ও গ কে কী ধরনের লোক ?

এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই ধরা পড়ে যে, ক কখনোই সম্ভ্রান্ত হতে পারে না। কারণ, সম্ভ্রান্ত হলে সে নিজকে সাধারণ বলতো না (সম্ভ্রান্তরা সব সময়ে সত্যি কথা বলে)। অতএব, ক হচ্ছে হয় সাধারণ অথবা প্রতারক।

প্রথমে ধরা যাক, ক হচ্ছে সাধারণ। সেক্ষেত্রে খ-র কথাটা সত্যি। অতএব খ হচ্ছে হয় সাধারণ অথবা সম্ভ্রান্ত। কিন্তু খ সাধারণ হতে পারে না, কারণ আগেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ক হচ্ছে সাধারণ। অতএব খ-কে সম্ভ্রান্ত হতে হবে। এখন বাকি রইল গ, তাকে অবশ্যই প্রতারক হতে হবে। কিন্তু সেটা কি হওয়া সম্ভব ? কখনোই নয়, কারণ সেক্ষেত্রে গ-র কথাটা ('আমি সাধারণ নই') সত্যি হয়ে যায়, আর আমরা জানি প্রতারকরা কখনোই সত্যি কথা বলে না। তার মানে হচ্ছে, আমাদের প্রথম অনুমানটাতে ভুল ছিল। ক সাধারণ নয়, সে হচ্ছে প্রতারক। সেক্ষেত্রে খ-র কথাটা মিথ্যে। এখন যেহেতু খ প্রতারক হতে পারে না, কারণ ক হচ্ছে প্রতারক—খ-কে সাধারণ হতে হবে। বাকি রইল গ, গ হবে সম্ভ্রান্ত।

১৯৮৩ সালে রেমন্ড স্মালিয়ানের 'দ্য লেডি অর দ্য টাইগার ?' বইটা প্রকাশিত হয়। ফ্র্যাঙ্ক স্টক্টনের ওই একই নামের এক গল্পে ছিল যে, এক বন্দীকে দুটো ঘরের মধ্যে একটা বাছতে হবে। একটা ঘরে রয়েছে এক সুন্দরী কন্যা, অন্য ঘরে এক ক্ষুধার্ত বাঘ। বন্দী যদি কন্যার ঘর বাছে, তাহলে সে সুন্দরীকে বিয়ে করতে পারবে। বাঘের ঘর বাছলে, অবশ্যই বাঘের পেটে যাবে!

ব্যাস্, স্মালিয়ান সায়েব তাঁর ধাঁধার মালমশলা পেয়ে গেলেন!

ধাঁধা শুরু হল এইভাবে :

এক রাজা স্টকটনের গল্প পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঠিক করলেন যে, তিনিও তাঁর বন্দীকে নিয়ে ও-রকম পরীক্ষা করবেন। তবে পরীক্ষার ফলটা তিনি বন্দীর ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেবেন না, ছেড়ে দেবেন তার যুক্তিবুদ্ধির ওপর। দুটো ঘরের সামনে তিনি একটা করে সাইন ঝোলালেন (ছবি)। তারপর বন্দীকে ডেকে এনে বললেন যে, দুটো ঘরের কোনওটাই শূন্য নয়, সেখানে হয় বাঘ অথবা রাজকন্যা আছে। তার মানে মোট তিনটে সম্ভাবনা : হয় দুটো ঘরেই বাঘ আছে, অথবা দুটো ঘরেই রাজকন্যা আছে, কিংবা একটা ঘরে রাজকন্যা ও অন্যঘরে বাঘ আছে। বন্দীকে বার করতে হবে, ঠিক কোন ঘরে রাজকন্যা আছে। সেটা পারলেই সে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে পারবে।

"কিন্তু যদি দুটো ঘরেই বাঘ থাকে ?" বন্দী প্রশ্ন তুলল।

"সেটা তোমার দুর্ভাগ্য।" রাজা গম্ভীরমুখে বললেন।

"আর যদি দুটো ঘরেই রাজকন্যা থাকে ?"

"সেটা তোমার সৌভাগ্য, এটাও আবার বলে দিতে হবে নাকি!" ধমক

লাগালেন রাজা।

"তা বটে," বন্দী মাথা চুলকালো, "কিন্তু আপনি বলেছেন—এও সম্ভব যে একটা ঘরে রাজকন্যা আর অন্যঘরে বাঘ রয়েছে।"

"আলবৎ বলেছি। সেক্ষেত্রে তুমি বাঁচবে না মরবে নির্ভর করবে, কোন ঘরটা বাছছো তার ওপর।"

"এই সেরেছে! কিন্তু আমি বুঝবো কী করে কোন ঘরে কী আছে? রাজা সাইন দুটোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "তোমার ঘটে যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে—তাহলেই বুঝবে।"

বন্দী সাইন দুটো বারকয়েক পড়ে জিজ্ঞেস করল, "মহারাজ, সাইন দুটোর কথাগুলো কি সত্যি?"

রাজা বললেন, "একটা সাইন শুধু সত্যি, অন্যটা মিথ্যে।"

প্রশ্ন হল, বন্দী কোন ঘরটা বাছবে?

সমস্যাটা জটিল মনে হলেও খুব জটিল কিন্তু নয়। রাজা বলেছিলেন যে, দুটো সাইনের মধ্যে একটা কেবল সত্যি, অন্যটা মিথ্যে। প্রথমে বিচার করা যাক যে, প্রথম ঘরের সাইনটা সত্যি হতে পারে কিনা। সেটা যদি সত্যি হয়, তাহলে সাইন অনুসারে প্রথম ঘরে আছে রাজকন্যা এবং দ্বিতীয় ঘরে আছে বাঘ। এদিকে দ্বিতীয় সাইনে লেখা আছে যে, একটা ঘরে আছে বাঘ ও আরেকটা ঘরে রাজকন্যা। এখন প্রথম সাইনটা যদি সত্যি হয়, তাহলে দ্বিতীয় সাইনটাও সত্যি। ঠিক কিনা? কিন্তু রাজার কথা অনুসারে সেটা তো হওয়া সম্ভব নয়। অতএব, প্রথম ঘরের সাইনটা মিথ্যে, দ্বিতীয় ঘরেরটা কেবল সত্যি। দ্বিতীয় ঘরের সাইন সত্যি হওয়া মানে: একটা ঘরে রাজকন্যা ও অন্য ঘরে বাঘ আছে। আর প্রথম সাইনটা মিথ্যে হওয়া মানে: প্রথম ঘরে

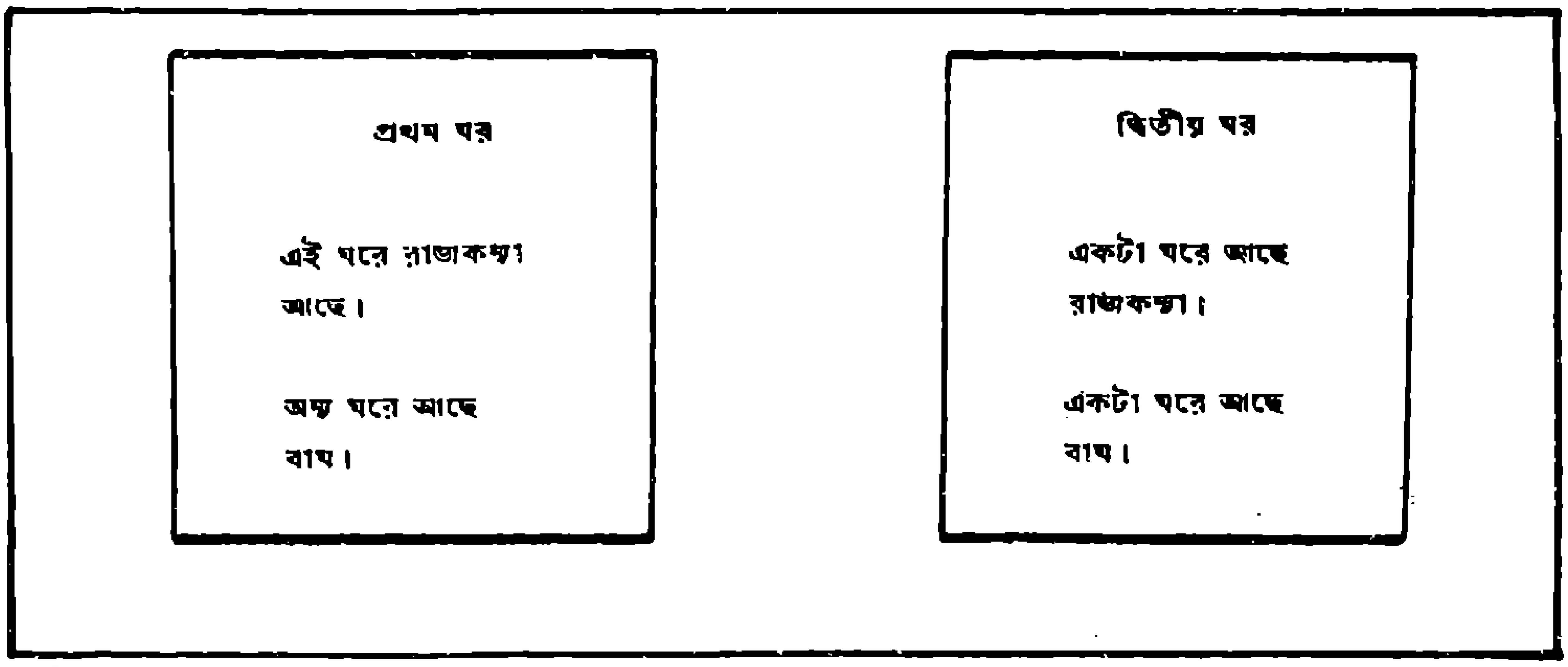

রাজকন্যা নেই, অর্থাৎ সে দ্বিতীয় ঘরে আছে।

'এলিস ইন পাজল-ল্যান্ড'-এ রেমন্ড স্মালিয়ান লুইস ক্যারলের বিখ্যাত রূপকথা 'অ্যালিসেস অ্যাডভেন্চারস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এর পাত্রপাত্রী ব্যবহার করে মজাদার সব সমস্যার সৃষ্টি করেছেন।

লালরানী অ্যালিসকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ভাগ করতে জানো ?"

অ্যালিস বলল, "বারে, না জানার কি আছে !"

"বেশ, ধর তুমি এগারো হাজার এগারোশো এগারোকে তিন দিয়ে ভাগ করছো, তাহলে অবশিষ্ট কত থাকবে ? চাও তো কাগজ পেন্সিল ব্যবহার করতে পারো।"

অ্যালিস কাগজে লিখল ১১১১১১। তাকে ৩ দিয়ে ভাগ করে অবশিষ্ট রইল ২।

"উত্তর হবে দুই।" অ্যালিস বলল।

"ভুল, সম্পূর্ণ ভুল !" দুলে দুলে মাথা নাড়ল লালরানী, "তুমি ভাগের কিসস্যু জানো না !"

তোমরা অনেকেই নিশ্চয়ই অ্যালিসের ভুলটা ধরতে পেরেছো ! এগারো হাজার এগারোশো এগারো হল :

১১,০০০
১,১০০
১১
―――――
১২,১১১

বারো হাজার একশো এগারোকে তিন দিয়ে ভাগ করলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

রেমন্ড স্মালিয়ানের বইগুলোর মস্তবড় গুণ হচ্ছে যে, ছোটবড় সকলের কাছেই সেগুলো সমানভাবে আকর্ষণীয়। যুক্তির গভীরতা লেখার সরসতার দরুণ প্রায়ই চোখে পড়ে না। সেখানেই তাঁর বাহাদুরি। স্মালিয়ানের প্রথম ধাঁধার বই প্রকাশিত হবার পর তিনি অসংখ্য চিঠিপত্র পান। তার মধ্যে একটি এসেছিল দশ বছরের একজন ছেলের কাছ থেকে। ছেলেটি স্মালিয়ানের বই পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেই একটা চমৎকার ধাঁধা বানিয়ে পাঠিয়েছে। সেটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে স্মালিয়ান তৎক্ষণাৎ ছেলেটিকে ফোন করেন। ফোন তোলেন

ছেলেটির বাবা, যিনি নিজেও একজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ এবং একসময়ে স্মালিয়ানের সঙ্গে কলেজে পড়াশুনো করেছিলেন। তিনি চুপি চুপি স্মালিয়ানকে বললেন, "রে (রেমন্ডের সংক্ষিপ্ত ডাক), আমার ছেলে তোমার বই ভালবাসে, সারাক্ষণ পড়ে। কিন্তু তুমি ভুলেও বোল না যে ওটা অঙ্কের বই। ও অঙ্ক একদম ভালবাসে না। যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় যে ও অঙ্ক শিখে যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে ও তোমার বই পড়া ছেড়ে দেবে !"

স্মালিয়ানের পাওয়া আরেকটা চিঠির কথা লিখে এ প্রসঙ্গটা শেষ করবো। এটিও ওঁর কাছে আসে প্রথম বইটি প্রকাশিত হবার পর। চিঠিটা একটি অচেনা মেয়ের লেখা। মেয়েটি স্মালিয়ানের একটা ধাঁধার সমাধানই একটু অন্যভাবে করে পাঠিয়েছে। স্মালিয়ান পড়ে দেখলেন যে তাঁর নিজের সমাধানটির চেয়ে মেয়েটির সমাধানেরই জৌলুস বেশি। ঠিক করলেন পরের সংস্করণে মেয়েটির সমাধান ব্যবহার করবেন। কিন্তু তার জন্য একটা অনুমতি নেওয়া দরকার। চিঠি লিখতে বসলেন স্মালিয়ান। প্রথমে অনুমতি চাইলেন, তারপর একথা সেকথার পর লিখলেন : আমি জানি না তুমি কী পড়ছো। যদি কলেজ ইতিমধ্যে শেষ না করে থাকো, তাহলে আমি বলবো যে তুমি ম্যাথাম্যাটিকস অনার্স নিয়ে পড়। কারণ তোমার সমাধান পড়েই আমি বুঝেছি যে, অঙ্কে তোমার মাথা খুব পরিষ্কার।

উত্তর এল কদিন বাদে : আপনার সদয় চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আপনি আমার সমাধানটাকে নিশ্চয় ব্যবহার করতে পারেন। আমার বয়স সাড়ে নবছর। আমি ফিফ্‌থ্‌ গ্রেডে পড়ি।

মাঝে মাঝে ভাবি এরকম সাড়ে নবছরের মাথা যদি পেতাম !

দুটি জনপ্রিয় ধাঁধার খেলনা

হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট শহরের 'স্কুল ফর কমার্শিয়াল আর্টিস্টস'-এর আর্কিটেকচারের অধ্যাপক আর্নো রুবিক (Ernő Rubik) যখন বুভো কোকা (Bűvös Kocka) বা ম্যাজিক কিউব উদ্ভাবন করেন, তখন তিনি কল্পনা করতে পারেননি যে, এই ধাঁধার খেলনা সারা পৃথিবীতে এতটা সাড়া জাগাবে ! ১৯৭৫ সালে রুবিক হাঙ্গেরিতে ম্যাজিক কিউবের পেটেন্ট নেন। তার কিছুদিন পরেই রুবিকের সঙ্গে চুক্তি করে আমেরিকার 'আইডিয়াল টয় কর্পোরেশন' এটিকে রুবিক্'স কিউব (Rubiks cube) নাম দিয়ে বাজারে ছাড়ে। তারপরেই ঘটে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ! ১৯৮০ শুরু হতে না হতেই রুবিক্'স কিউবের বিক্রি আড়াই কোটিও ছাড়িয়ে যায়। এছাড়া অসাধু ব্যবসায়ীর দল এর কত যে নকল বিক্রি করেছে তার কোনও ইয়ত্তাই নেই ! শোনা যায় তাইওয়ানে তৈরি একটা কিউবই নাকি বিক্রি হয়েছে সাত কোটি !

ম্যাজিক কিউবের উদ্ভাবক হিসেবে রুবিক খ্যাতিলাভ করলেও, তিনি কিন্তু এ ব্যাপারে একা ছিলেন না। প্রায় একই সময় এক জাপানী ইঞ্জিনীয়ার তেরুতোশি ইশিগে (Terutoshi Ishige) টোকিও শহর থেকে অল্প কিছু দূরে নিজের কারখানায় বসে ম্যাজিক কিউব তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। মজার ব্যাপার হল যে, তিনিও প্রায় একই নির্মাণ-কৌশল ব্যবহার করে ১৯৭৬ সালে জাপানে ম্যাজিক কিউবের পেটেন্ট নেন। যেটা দুঃখের বিষয়, সেটা হল ইশিগে কিউবের কথা বিদেশে কেউই জানলো না ! কোনো কোনো লোকের অবশ্য বিশ্বাস যে, রুবিক বা ইশিগে কেউই ম্যাজিক কিউবের প্রথম উদ্ভাবক নন। সেমাহ্ নামে ফ্রান্সের এক ইনস্পেক্টর জেনারেল দাবি করেছেন যে, বছর পঞ্চাশেক আগে কাঠের তৈরি ম্যাজিক কিউব তিনি মার্সাই (Marseilles) শহরে দেখেছেন। তারও বছর পনেরো আগে ইস্তাম্বুলে। কিন্তু তার প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ তিনি দেখাতে না পারায়, তাঁর এই দাবিকে কেউই গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু একথা ঠিক যে, আমেরিকার ফ্রেস্নো (Fresno) হাইস্কুলের এক শিক্ষক

উইলিয়াম ও গুস্তাফ্‌সন (William O. Gustafson) ১৯৫৮ সালে একটি ম্যাজিক গ্লোব তৈরি করেন। ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করলে এটিকে বলা যেতে পারে রুবিক্‌'স কিউবের পূর্বসূরি। ইংলন্ডের ফ্র্যাঙ্ক ফক্স (Frank Fox) ১৯৭০ সাল নাগাদ আরো জটিল একটি ম্যাজিক গ্লোব উদ্ভাবন করেন, এবং ১৯৭২ সালে ল্যারি নিকলস (Larry Nichols) তৈরি করেন রুবিক্‌স কিউবেরই একটি সরল সংস্করণ। অর্থাৎ জনপ্রিয় রুবিক্‌'স কিউবের আবির্ভাবের বেশ কয়েক বছর আগেও অন্তত কয়েকজন এ ধরনের খেলনার কথা ভেবেছেন, এবং অপেক্ষাকৃত সহজ কয়েকটি খেলনা তৈরিও করেছেন।

রুবিক্‌'স কিউব শুধু ধাঁধা নয়, এটা একটা অভিনব কৌশলের কল। একে বর্ণনা করা একটু মুশকিল। ছোট ছোট সাতাশটা কিউব জোড়া দিয়ে একটা বড় কিউব (ক)। বড় কিউবের ছ'টা মুখের (Face) প্রত্যেকটি ন'টি ছোট কিউবে তৈরি, আর প্রত্যেকটি মুখই আলাদাভাবে তার কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরতে পারে (খ)। প্রত্যেকটি ছোট কিউবের ছ'টি মুখ ভিন্ন রঙের। আর বড় কিউবটা যখন প্রথম আসে, তখন তারও এক একটা মুখ থাকে এক এক রঙের। তারপর বড় কিউবের মুখগুলো নানানভাবে ঘুরিয়ে রঙগুলো এলোমেলো করে দেওয়া হয় (গ)। খেলাটা হল সেই এলোমেলো অবস্থা থেকে আবার আগের মত এক রঙা অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

খেলাটা আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও বাস্তবে মোটেও নয়। তার কারণ হল রুবিক্‌'স কিউবকে মোট ৪৩,২৫২,০০৩,২৭৪,৪৮৯,৮৫৬,০০০ ভাবে এলোমেলো করে সাজানো যায়! লন্ডনের 'পলিটেকনিক অফ সাউথ ব্যাঙ্ক'-এর অঙ্কের অধ্যাপক ডেভিড সিংমাস্টার (David Singmaster) রুবিক্‌'স কিউব নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন এবং তার ওপর একটি প্রামাণ্য বইও

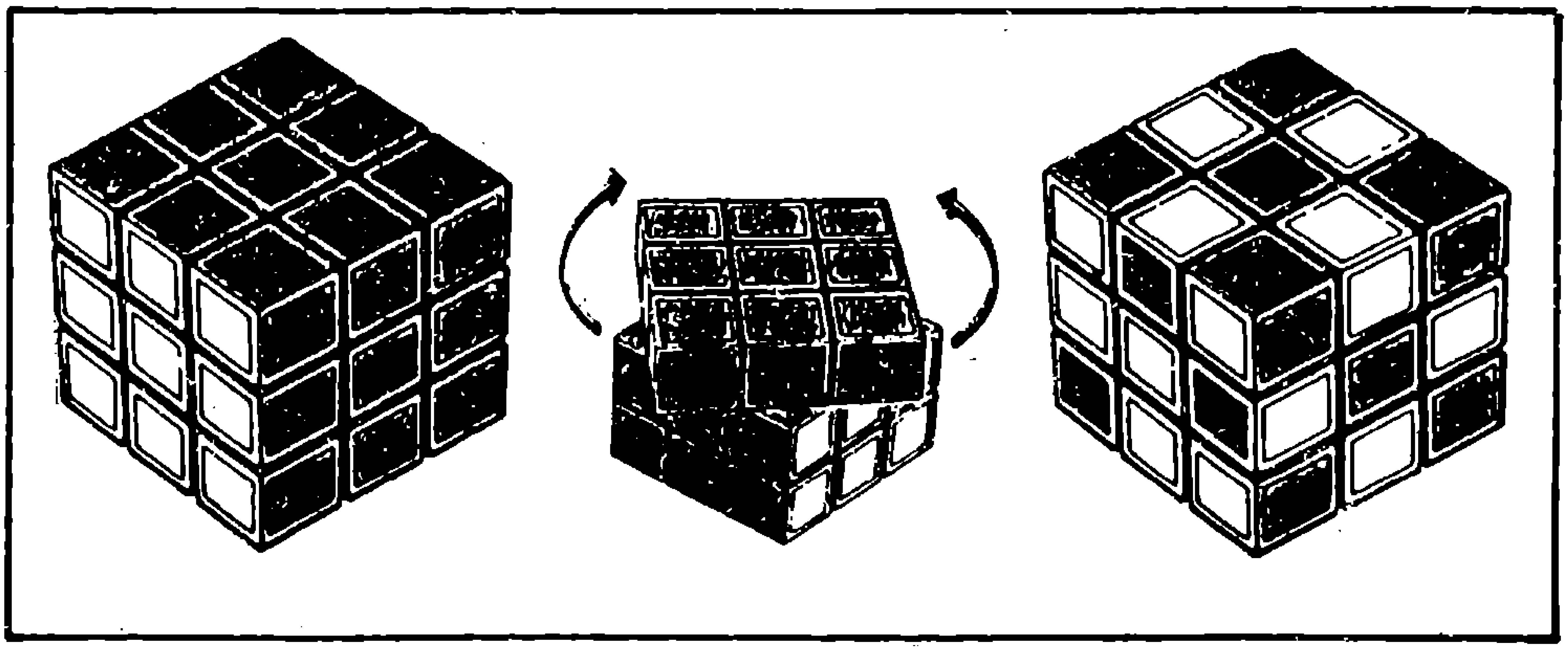

লিখেছেন। বইটির নাম 'নোটস অন রুবিক্'স ম্যাজিক কিউব'। সিংমাস্টারের মতে রুবিক'স কিউবের সমাধান করতে হলে অন্তত সপ্তাহ দুয়েক একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা করতে হবে। সাধারণ লোকের পক্ষে একসঙ্গে এতখানি সময় দেওয়া অবশ্যই অসম্ভব ! জগতে অন্যান্য কাজও রয়েছে, দিনরাত কিউব ঘোরালেইতো কেবল চলবে না ! যেটা জানা দরকার—সেটা হল কেউ যদি কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিউব নিয়ে খেলা করে, তাহলে তার কত সময় লাগবে ? কিউব বিশেষজ্ঞদের মতে নিতান্ত গবেট না হলে এক বছরের মধ্যে নিশ্চয় সে পারবে !

প্রশ্ন জাগতে পারে, এ হেন একটা কঠিন কাজ কেন লোকে যেচে ঘাড়ে নিতে যাবে ? শুধু তাই নয়, রুবিক্'স কিউব বিনি পয়সায় মেলে না। প্রথম যখন এটি বাজারে এসেছিল, তখন কড়কড়ে পনেরোটি ডলার না ফেললে খেলাটি হাতে পাওয়া যেত না। তবু কেন এর জন্য লোকে এত ক্ষেপলো ? তার একটা কারণ বোধহয় খেলাটার আপাত সরলতা। এটা দেখামাত্র মনে হয় যে, সহজেই এর সমাধান সম্ভব। কিন্তু একটু নাড়াচাড়া শুরু করলেই বোঝা যায় কী ভয়ানক এর জটিলতা ! এ যে দিল্লীকা লাড্ডু—খেলেও পস্তাবে, না খেলেও পস্তাবে ! কিন্তু এসব মন্তব্য হল সাধারণের জন্য। গণিতজ্ঞদের কাছে রুবিক'স কিউব হচ্ছে এক মজার নেশা। আধুনিক কালে এমন কোনো ধাঁধার খেলনা বেরোয়নি যা গণিতজ্ঞদের এতটা নাড়া দিয়েছে। কীভাবে এগোলে এর যে-কোনো এলোমেলো অবস্থা থেকে নিশ্চিতভাবে প্রাথমিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়—এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। কম্প্যুটার বিজ্ঞানীরা লম্বা লম্বা প্রোগ্রাম লিখেছেন। রুবিক'স কিউবের সমাধানের ওপর বই লিখে, কিছু কিছু ভাগ্যবান বেশ দু-পয়সা কামিয়েও নিয়েছেন ! শুধু তাই নয় গণিতজ্ঞ সলোমন গোলম্ব (Solomon W. Golomb) ম্যাজিক কিউবোলজির সঙ্গে পার্টিক্‌ল ফিজিক্সের একটা চমৎকার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন কম্পুটার বিজ্ঞানী ডগলাস হফস্টেটার (Douglas Hofstadter) তাঁর 'মেটাম্যাজিক্যাল থিমা' বইটিতে। এখানে সে সম্পর্কে লিখতে গেলে এই লেখাটাও জটিল হয়ে পড়বে।

রুবিক্'স কিউবের জনপ্রিয়তা যেরকম ঝড়ের বেগে তুঙ্গে উঠেছিলো, তেমনি কয়েকবছর যেতে না যেতেই ঝড়ের বেগে সেটা অদৃশ্য হয়েছে। আজকের ছোটদের মধ্যে অনেকই আছে যারা রুবিক'স কিউবের নামও শোনেনি। বাজারেও রুবিক'স কিউব আজকাল কদাচিৎ চোখে পড়ে। আমাদের দেশে রুবিক'স কিউব কোনোদিনই খুব একটা জনপ্রিয় হয়নি। তার

অন্যতম প্রধান কারণ, দেশের হিসেবে খেলনাটা ছিল খুবই দামি। তবু রুবিক'স কিউব প্রসঙ্গ শেষ করার আগে পাঠকদের একটা কথা জানানো দরকার, বিশেষ করে যারা রুবিক'স কিউব খেলাটার সঙ্গে পরিচিত এবং এর সমাধানে হাত পাকিয়েছে। যদি কোনোদিন রুবিক'স কিউবের অলিম্পিক কম্পিটিশন হয়, তাহলে সেখানে যোগ দেবার আগে তারা যেন বেশ ভালোভাবে এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে। কারণ, ইংল্যান্ডের নটিংহামের নিকোলাস হ্যামন্ডের যে-কোনো রুবিক-সমস্যা সমাধান করতে লাগে গড়ে মাত্র তিরিশ সেকেন্ড ! আমেরিকার চ্যাম্পিয়ান মিন থাই-য়ের চব্বিশ সেকেন্ড ! আর ইংল্যান্ডের কেমব্রিজের জন কনওয়ে কিউব সমাধানে এত পারদর্শী যে, আজকাল তিনি হাত পেছনে রেখে এর সমাধান করেন। শুধু বার চার-পাঁচ ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখে নিতে হয় যে, কাজটা কেমন এগোচ্ছে !

রুবিক'স কিউবের জন্মের প্রায় একশ বছর আগে আরেকটি ধাঁধার খেলনা

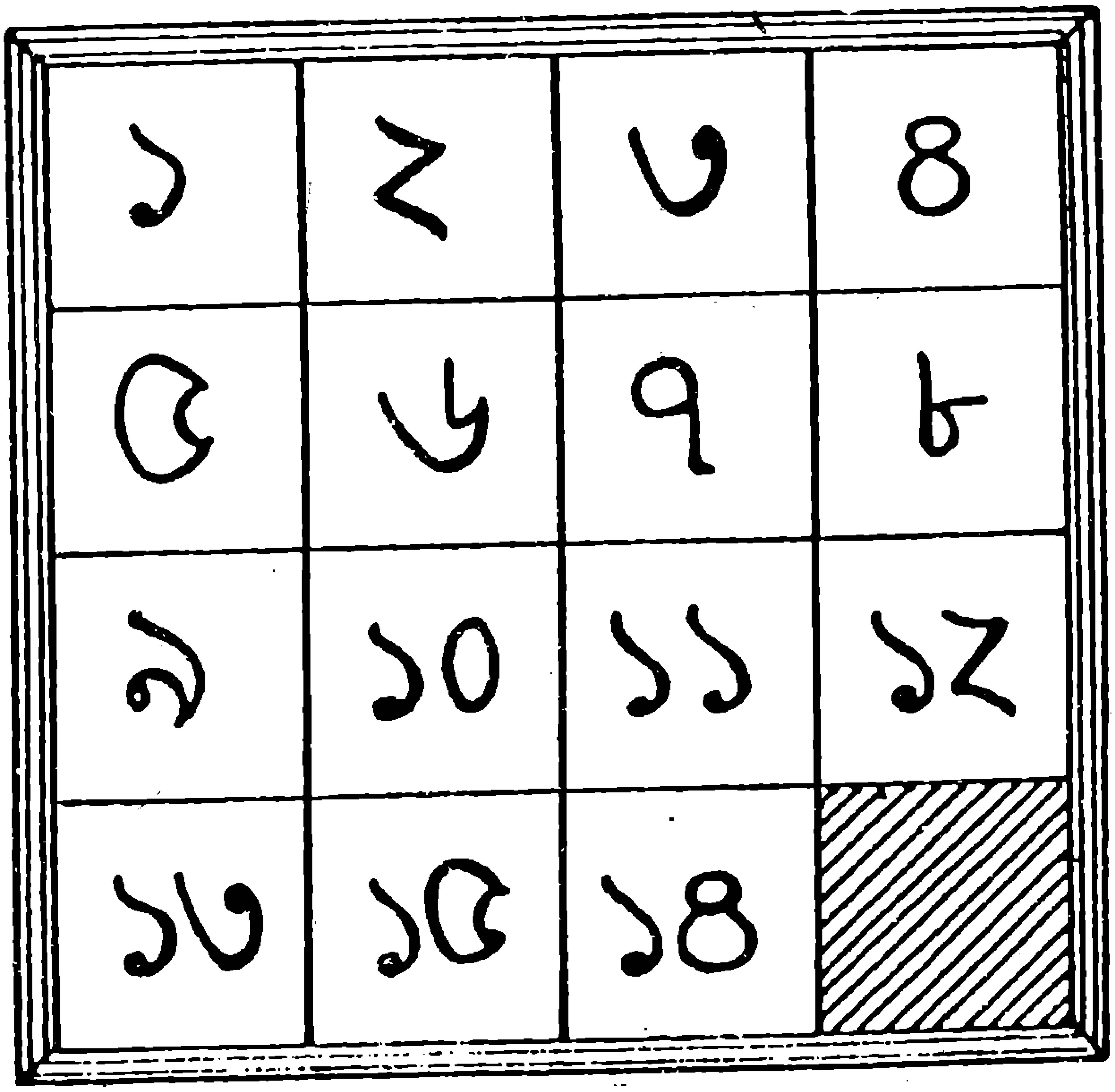

স্যাম লয়েডের '১৪-১৫'-র ধাঁধা বা 'বস' পাজল

প্রায় একইভাবে সারা বিশ্বে আলোড়ন জাগিয়েছিলো। সেটা হল স্যাম লয়েডের (Sam Loyd) '১৪-১৫ ধাঁধা' বা 'বস'। স্যাম লয়েড অবিসংবাদিত ভাবে আমেরিকার সবচেয়ে বড় ধাঁধাবিদ। এখনকার বহু জনপ্রিয় ধাঁধার সৃষ্টিকার হলেন স্যাম লয়েড। ধাঁধা লেখা ছাড়া স্যাম লয়েড ধাঁধার খেলনাও প্রচুর তৈরি করেছিলেন। '১৪-১৫ ধাঁধা' তার অন্যতম। একদিক থেকে বিচার করলে, '১৪-১৫ ধাঁধা' হল রুবিক'স কিউবের 'টু-ডাইমেনসেন্যাল' (Two Dimensional) সংস্করণ। কিন্তু এটা হল নম্বর সাজানোর খেলা। একটা চৌকো বোর্ডের ওপর ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত নম্বর লাগানো পনেরোটা চৌকো ঘুঁটি থাকে। শুধু ষোল নম্বরের জায়গায় কোনো ঘুঁটি থাকে না। এই ফাঁকা জায়গাটা থাকার দরুণ ঘুঁটিগুলো একে একে বোর্ডের ওপরেই ঠেলে সরানো চলে। খেলার প্রথমে সবগুলো নম্বরই পরপর সাজানো থাকে, কেবল ১৪ ও ১৫ ছাড়া। খেলাটা হল চৌকো ঘুঁটিগুলো বোর্ড থেকে না তুলে, ঠেলে ঠেলে সরিয়ে সব কটা নম্বর পর পর সাজানো।

'১৪-১৫ ধাঁধা' বাজারে প্রথম বেরোয় ১৮৭০ দশকে। বেরোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুধু আমেরিকাতে নয়, সারা বিশ্বেই এটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্যাম লয়েড এই জনপ্রিয়তা সম্পর্কে পরে লিখেছিলেন :

> লোকেরা এই ধাঁধা নিয়ে এত মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, অবিশ্বাস্য সব কাহিনী রটেছিল বাজারে। যেমন, দোকানদারদের নাকি আর দোকান খোলার কথা মনে থাকছে না, এক বিশিষ্ট ধর্মযাজক নাকি শীতের রাত্রে রাস্তার আলোর নীচে দাঁড়িয়ে কীভাবে ধাঁধাটার সমাধান করেছিলেন—সেটা মনে করার চেষ্টা করতে করতেই সারারাত কাটিয়ে দিয়েছেন—এইসব !

অবশ্য সবাই জানে যে, স্যাম লয়েড নিজের ধাঁধা সম্পর্কে বাড়িয়ে বাড়িয়েই লিখতেন।

লয়েড ঘোষণা করেছিলেন, প্রথম যে এই ধাঁধার সমাধান হাতে নাতে দেখাতে পারবে, তাকে এক হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। সে যুগে টাকার এই অঙ্কটা মোটেই ফ্যালনা ছিল না। বহুলোক তাই খেলনাটা কিনেছিল এবং বহুসময়ও ব্যয় করেছিল এর পেছনে। কিন্তু এক হাজার ডলার কেউই জিততে পারেনি। লয়েড দাবি করেছিলেন যে, '১৪-১৫ ধাঁধা'-র সবচেয়ে বড় রহস্য হল যে, যাদের বিশ্বাস তারা এই ধাঁধার সমাধান করেছে, তারাও কখনো মনে রাখতে পারবে না—কীভাবে তারা করেছে ! সেটা কিন্তু না জেতার আসল

কারণ নয়। আসল কারণটি গণিতজ্ঞরা পরে আবিষ্কার করেছিলেন। সেটা হল যে, এই ধাঁধার কোনো সমাধানই নেই! এই সত্যটা স্যাম লয়েড নিজে জানতেন কিনা—সেটা আজও রহস্য।

কেন '১৪-১৫ ধাঁধা'-র সমাধান অসম্ভব, সেটা নিয়ে দু-একটা কথা এখানে বলে নেওয়া যাক। এগুলো জানা থাকলে পাঠকরা কখনো এই ধরনের খেলা খেলতে গিয়ে ঠকবে না। অবশ্য '১৪-১৫ ধাঁধা' আজকাল বাজারে আর চোখে পড়ে না। তার মানে এই নয় যে, ভবিষ্যৎ-এ কখনো পড়বে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে হঠাৎ করে এই ধাঁধাটা আবার খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। নতুন করে যে আবার এটা জনপ্রিয় হবে না—কে তা বলতে পারে? সুতরাং কলাকৌশলগুলো জানা থাকাই ভাল।

'১৪-১৫ ধাঁধা'-র চৌকো ঘুঁটিগুলোর বিভিন্ন সম্ভাব্য বিন্যাস হিসেব করলে, তা দু হাজার কোটিরও বেশি দাঁড়ায়! যদি ধরা হয় যে, বিন্যাসগুলো সৃষ্টি করার সময় বোর্ড থেকে ঘুঁটিগুলো তোলা যাবে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু সম্ভাব্য বিন্যাসের সংখ্যা হবে সমস্ত সম্ভাব্য বিন্যাসের ঠিক অর্ধেক। অর্থাৎ, সমস্ত সম্ভাব্য বিন্যাসকে সমভাবে দুটো বিশিষ্ট ভাগে ভাগ করা যেতে পারে —যে দুটো ভাগ অঙ্কের ভাষায় হবে ভিন্ন 'প্যারিটি'র। বোর্ড থেকে ঘুঁটি না তুলে একটা বিন্যাস থেকে অন্য বিন্যাসে যাওয়া সম্ভব—যদি দুটো বিন্যাসই এক 'প্যারিটি'র হয়, তা না হলে সেটা সম্ভব নয়। হিসেব করে দেখানো যায় যে, ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত পরপর সাজালে যে বিন্যাসটি পাওয়া যায়—তার যে 'প্যারিটি', সেটা ১ থেকে ১৩ পর্যন্ত পরপর সাজিয়ে—তারপর ১৫ আর ১৪ বসানোর 'প্যারিটি' থেকে ভিন্ন। ফলে একটা থেকে আরেকটাতে যাওয়া সম্ভব নয়। ব্যাপারটা বোধহয় পারিষ্কার হল না। ঠিক আছে 'প্যারিটি'র একটা সহজ উদাহরণ নেওয়া যাক।

ধরা যাক, তিনটে গেলাস আছে। এদের টেবিলের ওপর মোট চারভাবে দাঁড় করানো যেতে পারে : (ক) তিনটেই সোজা, (খ) একটা সোজা, দুটো উল্টো, (গ) দুটো সোজা, একটা উল্টো, এবং (ঘ) তিনটেই উল্টো।

ধরা যাক, গেলাসগুলো প্রথমে সব সোজা ছিল (ক)। এবার আমরা নিয়ম করলাম যে, গেলাস কখনো একটা একটা করে সোজা উল্টো করা চলবে না, সব সময় দুটো দুটো করে করতে হবে। শুধু তাই নয়, যে-দুটো গেলাসের অবস্থা বদলানো হবে, তাদের বর্তমান অবস্থা যেন পরস্পরের থেকে ভিন্ন না হয়। বলা বাহুল্য, ইচ্ছেমত গেলাস সাজানোর সুযোগ এক্ষেত্রে আর রইলো

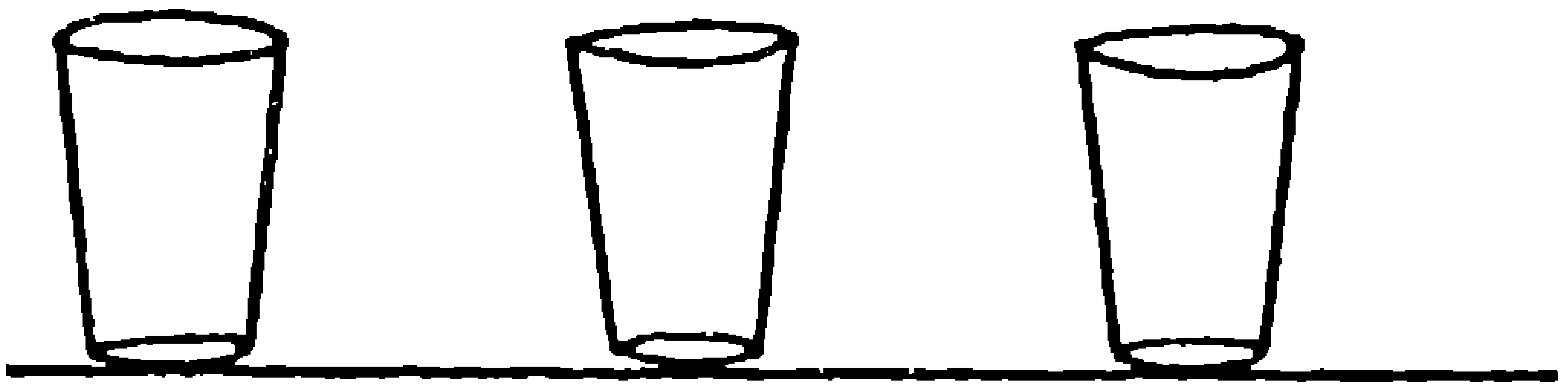

(ক)

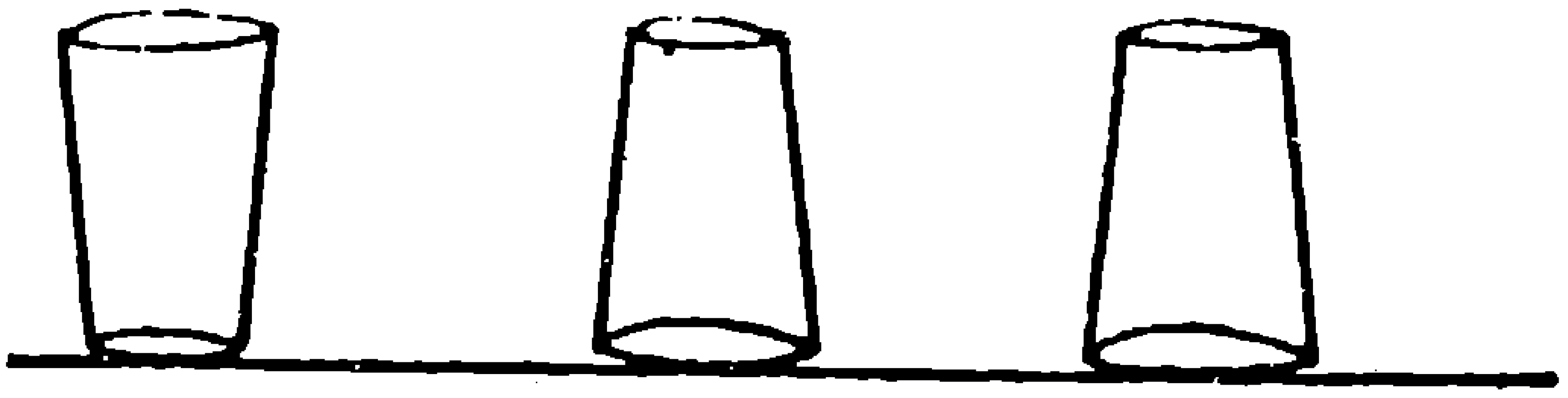

(খ)

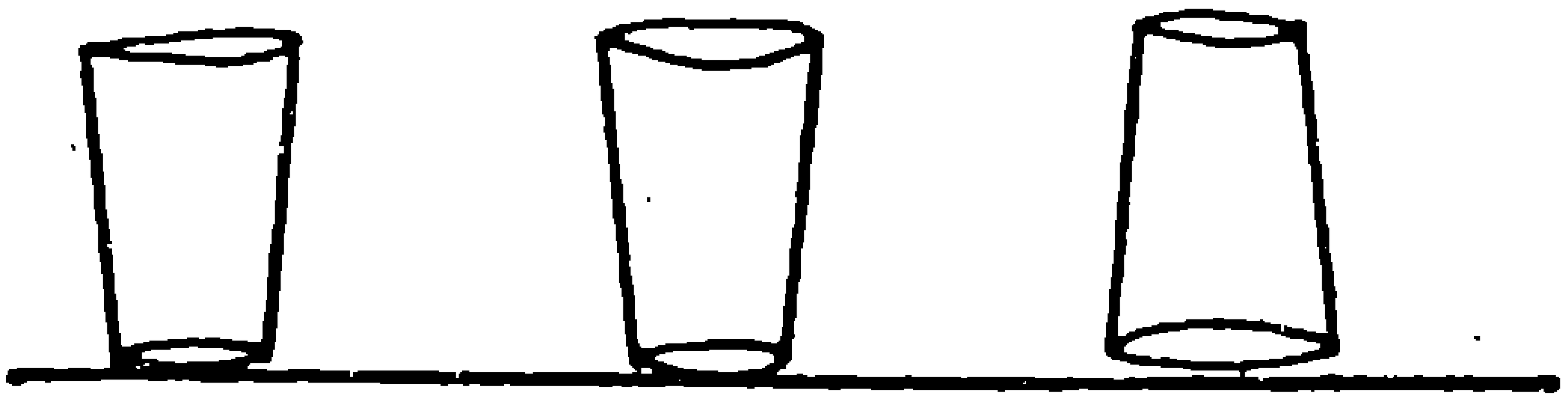

(গ)

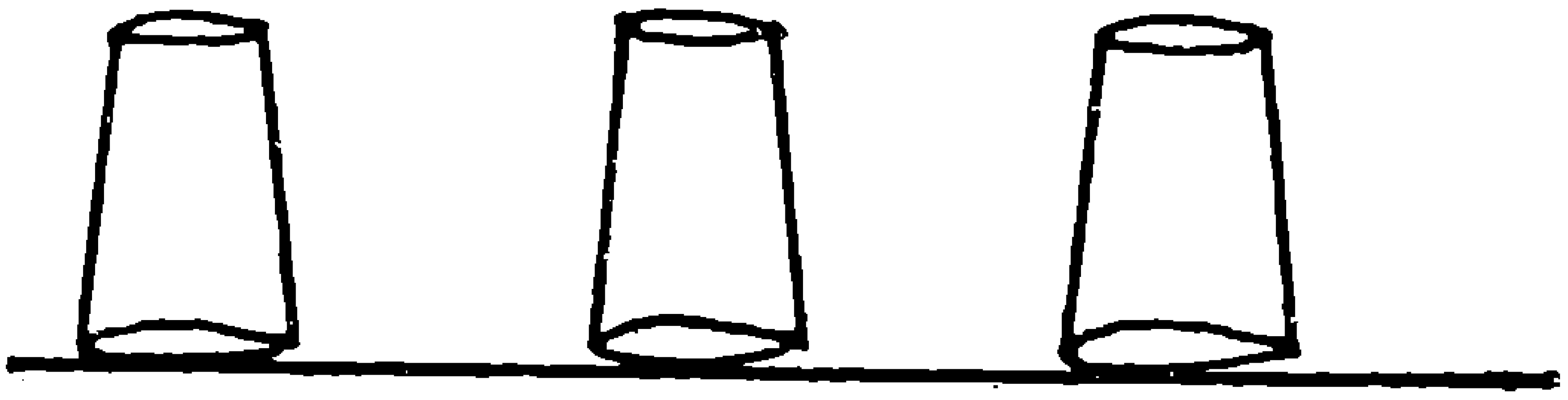

(ঘ)

না। (খেয়াল করলে চোখে পড়বে যে, এরকম হাত-পা বাঁধা নিয়ম কিন্তু '১৪-১৫ ধাঁধা'-তেও ছিল। যেমন, বোর্ড থেকে ঘুঁটি তুলতে পারা যাবে না।) যে-মুহূর্তে গেলাস সাজাবার এই নিয়মটা সবাইকে জানতে হবে, সেই মুহূর্তে আমরা দেখবো যে, (ক) থেকে (খ)-তে যাওয়াই একমাত্র সম্ভব, (গ) কিংবা (ঘ)-তে নয়। অন্যপক্ষে গেলাসগুলোর প্রাথমিক অবস্থান যদি (ঘ) হয়, তাহলে (ঘ) থেকে (গ)-তে যাওয়া সম্ভব, (ক) কিংবা (খ)-তে নয়। অর্থাৎ, যদিও গেলাসের মোট চারটি বিন্যাস সম্ভব, কিন্তু গেলাস সরাবার কতগুলো বিশেষ নিয়ম আরোপ করে দেবার দরুণ, কোনক্ষেত্রেই দুটো বিন্যাসের বেশি পাওয়া সম্ভব হবে না। প্রসঙ্গত এই সমস্যায় (ক) ও (খ) বিন্যাসদুটি এক 'প্যারিটি'র, (গ) ও (ঘ) অন্য 'প্যারিটি'-র। এবার আবার '১৪-১৫ ধাঁধা'-য় ফিরে আসি। ধরা যাক '১৪-১৫ ধাঁধা'-কে পাল্টে দিয়ে অনেকটা রুবিক'স কিউবের ধাঁধার মত করে খেলা হবে। অর্থাৎ প্রথমে ঘুঁটিগুলো একেবারে এলোমেলো করে দেওয়া হবে, তারপর বলা হবে যে, ঘুঁটিগুলো ঠেলে ঠেলে সরিয়ে পরপর সাজাতে। 'প্যারিটি'র আলোচনা থেকে এটা নিশ্চয় স্পষ্ট যে, কাজটা সম্ভব কিনা সেটা নির্ভর করছে, এলোমেলো অবস্থা আর ১ থেকে ১৫ অবস্থা—একই প্যারিটির কিনা তার ওপর। সেটা হবার সম্ভাবনা ১/২, কারণ দুটি 'প্যারিটি'তেই আছে সমান সংখ্যক বিন্যাস। কিন্তু এর থেকে জোর করে বলা যাবে না যে, সমাধান আছে কি নেই। তবে সেটা বার করার একটা সহজ উপায় অছে। তার জন্য হিসেব করতে হবে যে, যদি ঘুঁটিগুলো বোর্ড থেকে তুলতে পারা যেত, তাহলে প্রথম অবস্থা থেকে শেষ অবস্থায় নিয়ে যেতে মোট কতবার দুটো ঘুঁটির মধ্যে স্থান পরিবর্তন করতে হত। এই সংখ্যাটা জোড়সংখ্যা হলে—সমাধান সম্ভব, বিজোড় হলে সম্ভব নয়। '১৪-১৫ ধাঁধা'-য় স্যাম লয়েড সবগুলো ঘুঁটি পরপর সাজিয়ে শুধু ১৫ আর ১৪-কে উল্টো করে সাজিয়েছিলেন। এই অবস্থার পরিবর্তন করে ঘুঁটিগুলো পরপর সাজাতে দুটো ঘুঁটির মাত্র একবার স্থান পরিবর্তন দরকার—সেটা হল ১৪ আর ১৫-র মধ্যে। এখন ১ হচ্ছে বিজোড় সংখ্যা, সুতরাং এর সমাধান অসম্ভব।

'১৪-১৫ ধাঁধা' এবং রুবিক'স কিউবের অসাধারণ ব্যবসায়িক সাফল্য অনেককে উদ্বুদ্ধ করেছে—এদের সূত্র ধরে নতুন নতুন খেলনা সৃষ্টি করতে। '১৪-১৫ ধাঁধা'র ক্ষেত্রে মূল কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয়নি। অনেক সময় সংখ্যার বদলে ব্যবহার করা হয়েছে অক্ষর, যাতে অক্ষরগুলো ঠিকমত সাজালে একটা বাক্য সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংখ্যার বদলে ছবির একটা

অংশ ঘুঁটির ওপর আঁকা হয়েছে, ঘুঁটিগুলো ঠিকমত সাজাতে পারলে তবেই সম্পূর্ণ ছবিটা পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে খেলাটা JIGSAW PUZZLE-এর মত হলেও, সমাধান বহুগুণ কঠিন।

রুবিক'স কিউবের ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো কিন্তু এত অল্পের ওপর দিয়ে যায়নি। ক্যালিফোর্নিয়ার কার্স্টেন মাইয়ার (Kersten Meier) এবং ইন্ডিয়ানার বেন হ্যালপার্ন (Ben Halpern) সৃষ্টি করেছেন ম্যাজিক পিরামিড। অধুনা হংকং নিবাসী জার্মানীর এক উদ্ভাবক ইউ মেফার্ট (Uwe Meffert) 'পিরামিঙ্কস' বা পিরামিডাল কিউব উদ্ভাবন করে এটিকে খেলনা হিসেবে বিক্রি করতে শুরু করেছেন। হংকং-এর চাইনীজ ইউনিভার্সিটির অঙ্কের অধ্যাপক রনাল্ড টার্নার-স্মিথ (Ronald Turner-Smith) 'পিরামিঙ্কস'-এর ওপর একটা উৎকৃষ্ট বইও লিখে ফেলেছেন। এছাড়া আছে 'ইমপসি-বল'। এর উদ্ভাবকও হলেন এক জার্মান, উলফগ্যাঙ্গ কুপারস্ (Woolfgang Küppers)। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর কোনোটাই সেরকম জনপ্রিয় হতে পারেনি। আসলে বোধহয় কিউব ঘেঁটে ঘেঁটে সেই মোহটা আর নেই!

আজ থেকে বহু বছর বাদে যখন লোকে রুবিক'স কিউব বা '১৪-১৫ ধাঁধা'-কে ভুলে যাবে, তখন কোনো সুচতুর ব্যবসায়ী নিশ্চয় আবার এদের বাজারে ছাড়বে। মনে হয় ব্যবসায়ে সে ঠকবে না। কারণ মানুষের ধাঁধাপ্রিয় মন হল চিরন্তন, আর '১৪-১৫ ধাঁধা'-র আকর্ষণীয়তা একশ বছর আগেও যা ছিল—একশ বছর পরেও তাই থাকবে—কিউবের যাদুও ফুরিয়ে যাবে না।

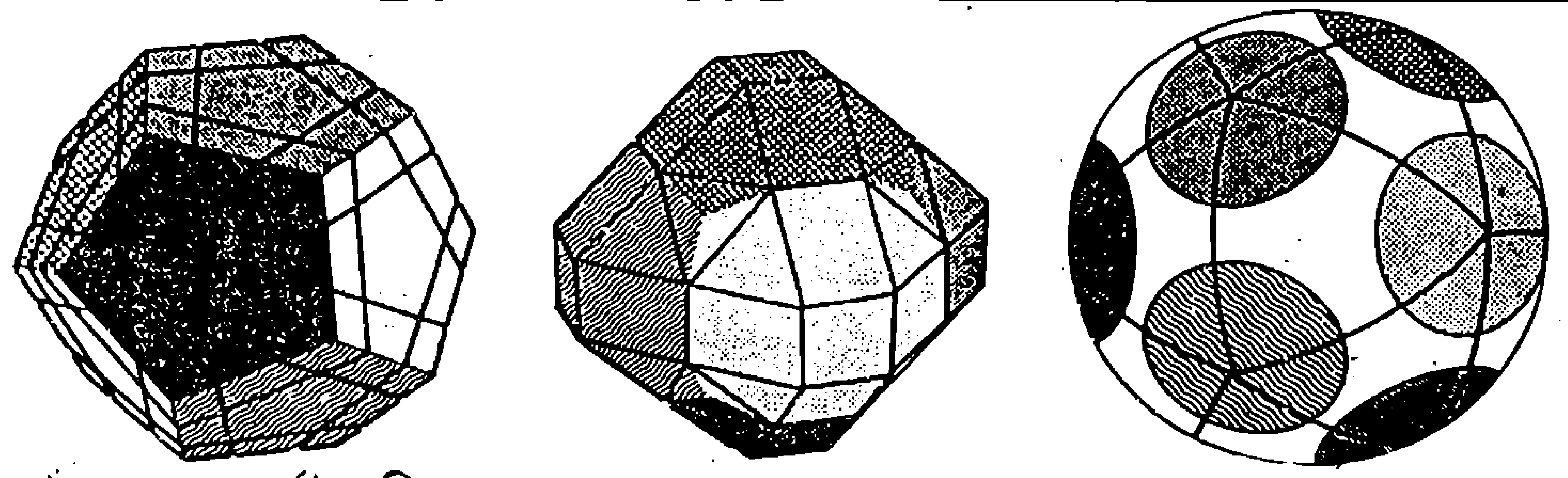

মাইয়ার-হ্যালপার্ন পদ্ধতিতে তৈরী ম্যাজিক ডোডেকাহেড্রন — 'পিরামিঙ্কস আলটিমেট' 'ইমপসি-বল'

এই বইয়ের নাম অন্য মলাটে

সুজন দাশগুপ্ত